শুকতারা

৫৮

পঞ্চম সংখ্যা
আষাঢ় · ১৪১২
১০·০০

বিশেষ ভৌতিক সংখ্যা

DEV'S DICTIONARIES

A. T. Dev

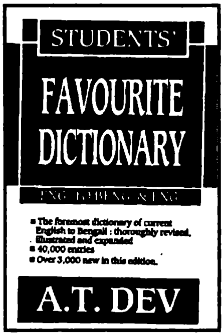

Students' Favourite Dictionary

এখন

DEV'S

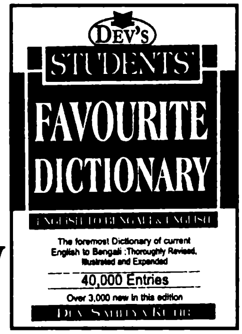

Students' Favourite Dictionary

(Eng. to Beng. & Eng.) Rs. 200.00

সবই এক আছে শুধু নামটাই বদলেছে

Revised and Edited by **Jyotibhusan Chaki**

DEV'S The New Edition

MIDGET DICTIONARY Rs. 35.00

(Eng. to Beng. & Eng.)

The Midget—in some aspects surpasses its elders

Students' Favourite Dictionary

(Beng. to Eng.) Rs. 160.00

Dev's Concise Dictionary

(Eng. to Beng. & Eng.)

Rs. 100.00

Dev's Concise Dictionary

(Beng. to Eng.)

Rs. 95.00

Pocket Dictionary

(Eng. to Beng. & Eng.)

Rs. 80.00

Pocket Dictionary

(Beng. to Eng.)

Rs. 70.00

শব্দবোধ অভিধান ১৬৫.০০

সরল অভিধান ৫০.০০

নববিধান ৮৫.০০

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড □ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

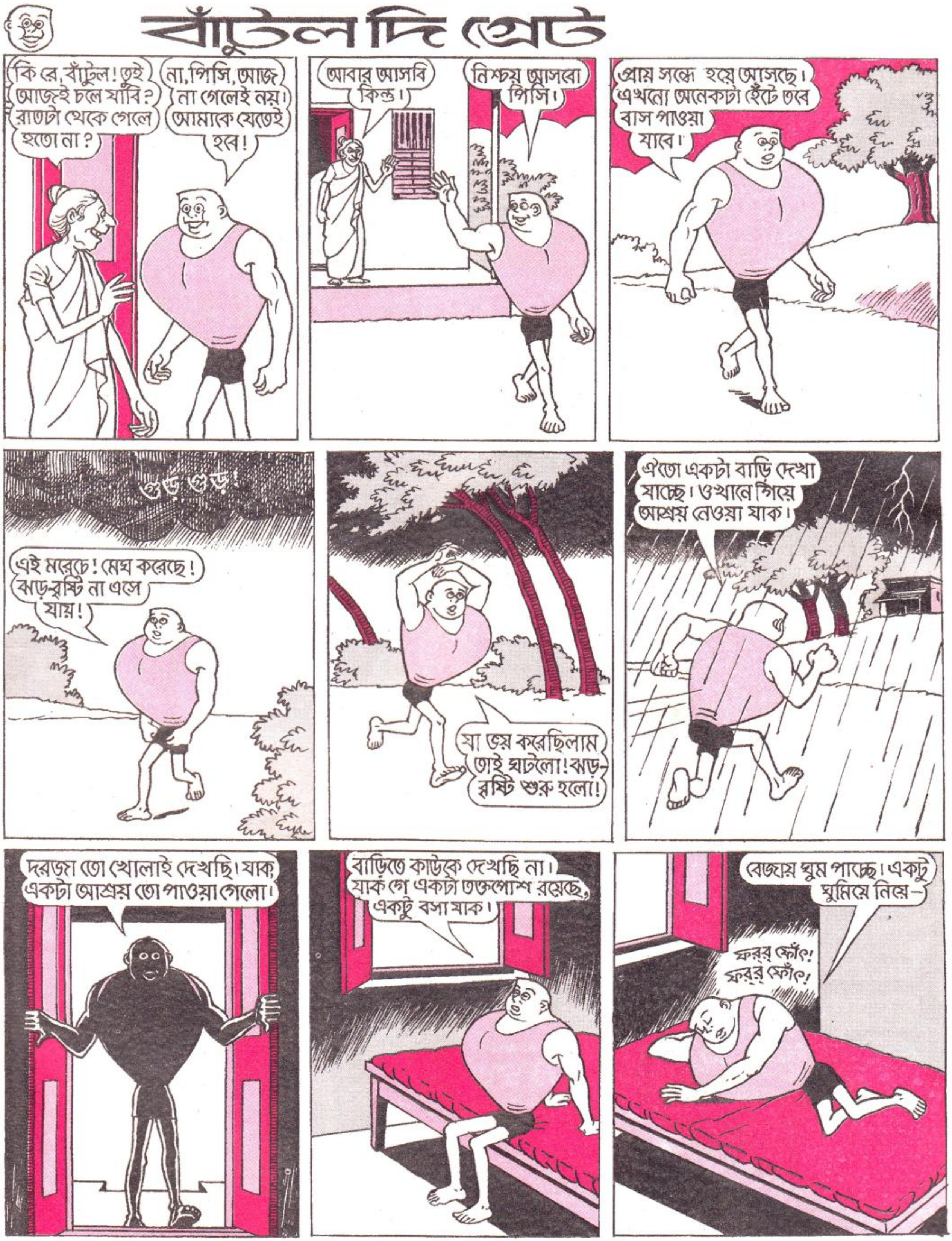
বাঁটুল দি গ্রেট
কি রে, বাঁটুল! তুই আজই চলে যাবি? রাতটা থেকে গেলে হতো না?
না, পিসি, আজ না গেলেই নয়। আমাকে যেতেই হবে!
আবার আসবি কিন্তু।
নিশ্চয় আসবো পিসি।
প্রায় সন্ধে হয়ে আসছে। এখনো অনেকটা হেঁটে তবে বাস পাওয়া যাবে।
গুড় গুড়!
এই মরেচে! মেঘ করেছে! ঝড়-বৃষ্টি না এসে যায়!
যা ভয় করেছিলাম তাই ঘটলো! ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো!
ঐতো একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ওখানে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাক।
দরজা তো খোলাই দেখছি। যাক, একটা আশ্রয় তো পাওয়া গেলো।
বাড়িতে কাউকে দেখছি না। যাক গে একটা তক্তপোশ রয়েছে, একটু বসা যাক।
বেজায় ঘুম পাচ্ছে। একটু ঘুমিয়ে নিয়ে—
ফরর্ ফোঁৎ! ফরর্ ফোঁৎ!

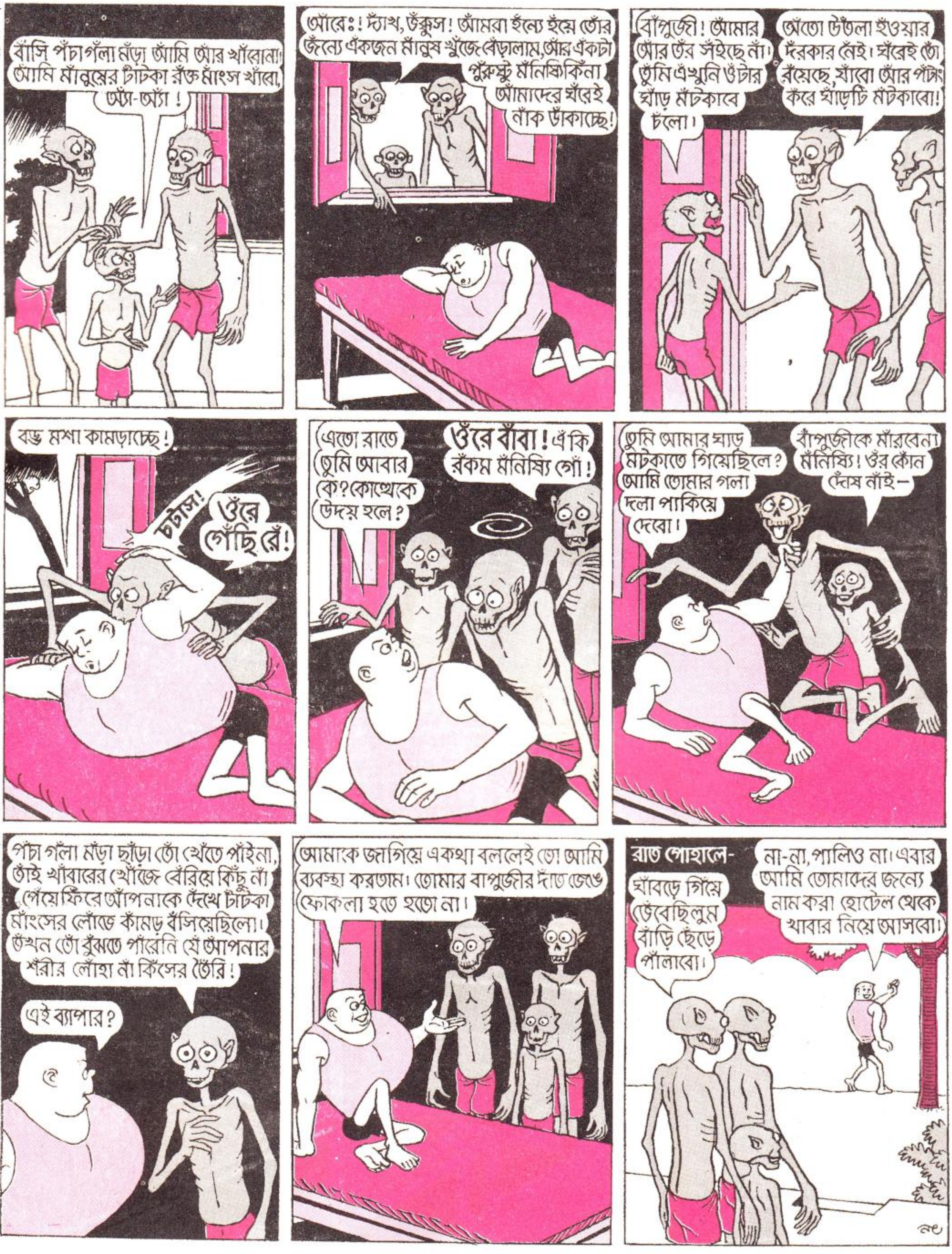

বাসি পঁচাগলা মড়া আমি আর খাঁবোনা। আমি মাঁনুষের টাটকা রঁক্ত মাংস খাঁবো, অ্যাঁ-অ্যাঁ !
আঁরেঃ! দ্যাখ, টঁক্কুস! আঁমরা হঁন্যে হঁয়ে তোঁর জঁন্যে একজন মাঁনুষ খুঁজে বেঁড়ালাম, আঁর একটা পুঁরুষ্টু মাঁনিষ্যি কিঁনা আঁমাদ্দের ঘঁরেই নাঁক ডাঁকাচ্ছে!
বাঁপুজী! আঁমার আঁর তঁর সঁইছে নাঁ। তুঁমি এঁখুনি ওঁটার ঘাঁড় মঁটকাবে চঁলো।
অঁতো উঁতলা হঁওয়ার দঁরকার নেঁই। ঘঁরেই তোঁ রঁয়েছে, যাঁবো আঁর পঁটাং কঁরে ঘাঁড়টি মঁটকাবো!
বড্ড মশা কামড়াচ্ছে!
চটাস!
ওঁরে গেঁছি রেঁ!
এতো রাতে তুমি আবার কে? কোত্থেকে উদয় হলে?
ওঁরে বাঁবা! এঁ কি রঁকম মাঁনিষ্যি গোঁ!
তুমি আমার ঘাড় মটকাতে গিয়েছিলে? আমি তোমার গলা দলা প্যাকিয়ে দেবো।
বাঁপুজীকে মাঁরবেনা মাঁনিষ্যি! ওঁর কোঁন দোঁষ নাঁই—
পঁচা গঁলা মঁড়া ছাঁড়া তোঁ খেঁতে পাঁইনা, তাঁই খাঁবারের খোঁজে বেঁরিয়ে কিঁছু নাঁ পেঁয়ে ফিঁরে আঁপনাকে দেঁখে টাঁটকা মাঁংসের লোঁভে কাঁমড় বঁসিয়েছিলো। তঁখন তোঁ বুঁঝতে পাঁরেনি যেঁ আঁপনার শঁরীর লোঁহা নাঁ কিঁসের তৈঁরি!
এই ব্যাপার?
আমাকে জাগিয়ে একথা বললেই তো আমি ব্যবস্থা করতাম। তোমার বাপুজীর দাঁত ভেঙে ফোকলা হতে হতো না।
রাত পোহালে-
ঘাঁবড়ে গিঁয়ে ভেঁবেছিলুম বাঁড়ি ছেঁড়ে পাঁলাবো।
না-না, প্যালিও না। এবার আমি তোমাদের জন্যে নাম করা হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসবো।

আষাঢ় ১৪১২, জুন ২০০৫

শুকতারা ৫৮

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটোদের সেরা মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

বিশেষ ভৌতিক সংখ্যা

গল্প

অদৃশ্য ব্যাপার-স্যাপার—মানবেন্দ্র পাল ... ১৮

এই মুহূর্তে— নির্মলেন্দু গৌতম ৭১

রক্তমুখী ড্রাগন—হীরেন চট্টোপাধ্যায় ... ৮

দুঃখীরাম শান্তিরাম—মণিলাল মুখোপাধ্যায় ... ৫২

প্রত্যাবর্তন—রামপ্রসাদ দে ৫৯

এক ঐতিহাসিক প্রেতাত্মা—আদিত্য বোস ... ৬৮

ভয়ঙ্কর সেই রাত— পারমিতা সিনহা ... ৪৯

কথা দিয়ে—যদুপতি মল্লিক ৫৬

পুরস্কৃত গল্প

আত্মজা (প্রথম)—সুপ্রসা রায় ৩৮

কাজের মাসি (দ্বিতীয়)

—সোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪০

ফিচার

ডাকটিকিটে কত কি— কবিতা রায় ... ৬১

কেরিয়ার গাইড—ডি. এ. চন্দ্রণ ৫৫

ক্রীড়াঙ্গন

খেলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩

উঠছে যারা—বীরু বসু ৪৮

ফিরে দেখা

৩২

ভূতের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েই পড়ল ডল্‌ফ। হঠাৎই ভেঙে গেল ঘুম। মোমবাতি তখনও জ্বলছে। সেই আলোতে ডল্‌ফ দেখল, এসেছে ভূত, সত্যিই এসেছে। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহার অনুবাদ করা গল্প পাতালের মাতুল।

ধারাবাহিক উপন্যাস

১২

গুজরাটের উপকূলবর্তী খাঁড়িতে কাজ করতে করতে নিখোঁজ হয় দুর্জয়। ওই অঞ্চলের জিয়োলজিস্টরা মনে করেন সে দুর্ঘটনায় মৃত কিন্তু দুর্জয়ের মা বিশ্বাস করেন দুর্জয় ওখানেই কোথাও আছে। কারণ সে যে রোজ রাত্রে ডাকে মাকে। সঙ্কর্ষণ রায়ের রোমাঞ্চকর কাহিনি খাঁড়ি-রহস্য।

বিশেষ আকর্ষণ

২২

নাসার পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকায় যত প্লেন ক্র্যাশ হয়েছে তার শতকরা কুড়িভাগই ঘটেছে পাইলটদের ভুল-ভ্রান্তির জন্য এবং তার মূল কারণ ছিল শুধুই অবসাদ। প্রয়োজনীয় ঘুমের অবকাশ না পেলে কী কাণ্ড যে ঘটতে পারে তাই নিয়েই এবারের এয়ার ক্র্যাশ সিরিজ। লেখক বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

শুকতারা

কবিতা ও ছড়া

বৃষ্টি ছুটি—ঋত্বিক ঠাকুর ... ৭
ভূতের দেখা—মানস সরকার ... ৬৭
ভূত-পরিবার—পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ... ৬৭
ভূতের ফাঁদ—নারায়ণ চন্দ্র দাস ... ৬৭
লাগ ভেল্কি—বিমল মৈত্র ... ৬৭

বিভাগীয় লেখা

চিঠিপত্র ... ১৭
মনের জানলা—জগদিন্দ্র মণ্ডল ... ৫১
দাদুমণির চিঠি ... ২৭
তোমাদের পাতা ... ২৮
মজার পাতা ... ৬৪

ছবিতে গল্প

বাঁটুল দি গ্রেট—নারায়ণ দেবনাথ ... ৩
হাঁদা-ভোঁদা—নারায়ণ দেবনাথ ... ৩০
বাহাদুর বেড়াল—নারায়ণ দেবনাথ ...
বিচ্ছুর জাদুশক্তি—জুরান নাথ ... ৬২

ঘোষণা

কানাইলাল ঘোষ স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতা ... ৪২
জানো কী! ... ৩৯

ফিচার ৫৮

চকোলেট খেলে নাকি কাশি সারবে; মহাকাশে খোঁজ মিলেছে এক কোয়াসারের; তৈরি হয়েছে উন্নত ধরনের রোবট; আকাশে এবার উড়বে সুপার জাম্বো জেট—হরেক চমক নিয়ে হজির সন্দীপ সেন তাঁর **বিজ্ঞানের খবর-এ**।

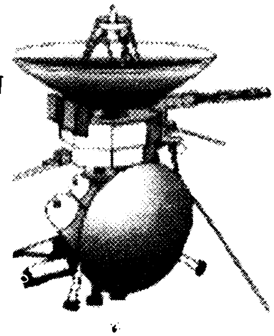

খেলা

শচীন তেন্ডুলকার বত্রিশ বছরে পা দিলেন। গত ষোল বছর ধরে তিনি দাপটের সঙ্গে খেলে চলেছেন। টেস্ট ক্রিকেটে ৩৪টি সেঞ্চুরি করে সুনীল গাভাসকারের সঙ্গে তিনি এখন একাসনে। আর একটি সেঞ্চুরি করলেই তিনি হবেন বিশ্ব রেকর্ডের মালিক। ওদিকে একদিনের ক্রিকেটে ইতিমধ্যেই তিনি সব থেকে বেশি রান করে বসে আছেন। এবারের **খেলা** বিভাগে শচীন তেন্ডুলকারকে নিয়ে বিশেষ লেখা।

প্রচ্ছদ ঃ অমিত চক্রবর্তী

Approved by the Directorate of Public Instruction West Bengal as Children's Monthly Magazine Vide Memo No. 456 (17) T.B.C. (Dated 5-7-88)
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য হাতে নিলে ১১০ টাকা, ডাকে ঃ বুকপোস্টে ১৫০ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ৩২৫ টাকা।
Annual Subscription : UK and USA—By Air Mail Rs. 645.00. R.N.I Registration No. 2621/57
ফোন নং ঃ ২৩৫০-৪২৯৪, ২৩৫০-৪২৯৫, ২৩৫০-৭৮৮৭ ই-মেল ঃ dev_sahitya@vsnl.net ওয়েবসাইট ঃ www.dev-sahitya-kutir.s5.com
যোগাযোগের সময়—(সোম থেকে শুক্রবার) সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা এবং শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

মূল্য ঃ দশ টাকা

শুকতারা
আষাঢ় ১৪১২, জুন ২০০৫

বৃষ্টি ছুটি

ঋত্বিক ঠাকুর

এক বৃষ্টি ইল্‌শেগুড়ি, এক বৃষ্টি ফাঁকি—
বৃষ্টি ভেজার গপ্পো ছাড়া পদ্য জমে নাকি!
বৃষ্টি এলেই মনে পড়ে ব্যাঙের বাসাবাড়ি,
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর পুকুর জুড়ে মেঘের দেশে পাড়ি।
বৃষ্টি মাথায় ওই কে চলে স্কুল পালানো ছেলে—
যাচ্ছে বুঝি গড়ের মাঠে বইয়ের পাহাড় ঠেলে।
পড়া-লেখা শিকেয় তুলে এখন কেবল খেলা,
বৃষ্টি পাড়ায় সারাটা দিন টাপুর টুপুর মেলা।
সন্ধেবেলা ফেরার পালা এ-হাট সে-হাট ঘুরে,
খোশমেজাজের তেলেভাজা দিলেই মুখে পুরে
টিফিনটা বেশ জমবে তবে স্কুল ভোলানো গানে,
মা-বাবা কী জানবে বলো, বৃষ্টি ছুটির মানে!

ছবি ঃ বিজন কর্মকার

রক্তমুখী ড্রাগন

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

কয়েক মুহূর্ত আগেও বুঝতে পারিনি এত বড়ো একটা দুঃসংবাদ আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। কিছু বুঝবারই ক্ষমতা ছিল না ঘণ্টাখানেক। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সমস্ত ঘটনা যখন শুনলাম তখন রাত অনেক হয়ে গেছে, কৃষ্ণনগর থেকে ফিরবার কোনো উপায় তখন আর নেই।

ভুলটা আসলে আমিই করেছিলাম। সন্ধের গাড়িতে যাচ্ছি যখন, একটা ফোন করে গেলেই সবচেয়ে ভালো হত। কিন্তু এরকম কোনো ব্যাপার যে হতে পারে সেটাই বা বুঝব কেমন করে। গত সপ্তাহেও তো ফোনে কতক্ষণ কথা হল। বাড়ি আসাটা বরং দারুণ একটা সারপ্রাইজ হবে ভেবে আনন্দে তো লাফাতে লাফাতেই এসেছি সারাটা রাস্তা। সেইজন্যেই বোধহয় এরকম একটা মর্মান্তিক আঘাত আমাকে পেতে হল।

বনজিতের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়িটা অবশ্য ধরতে গেলে এই বছরখানেকের কিছু বেশি। এম. এসসি পাশ করার পর একসঙ্গেই নেট দিয়েছিলাম দুজনে। আমার চাকরিটাই দরকার ছিল, সেটাই নিয়ে নিলাম, বনজিৎ নিল জে-আর-এফ অর্থাৎ কিনা গবেষণার কাজ। আমি পড়াতে যাই বেহালা পেরিয়ে সেই ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুর, বনজিৎ পড়ে থাকে কল্যাণীতে, সোম থেকে শুক্র একই রুটিন। তাই ইচ্ছে থাকলেও দেখা করার আর কোনো উপায়ই নেই।

ঠিক এরকম না হলেও ছাড়াছাড়ি খানিকটা হয়েছিল এম. এসসি পড়ার সময়ই, কারণ ওর বায়ো সায়েন্স, আমার পিওর সায়েন্স। তবে তার আগে স্কুল আর কলেজ একসঙ্গে, তখন দেখা না হবার তো কোনো উপায়ই নেই। কৃষ্ণনগরের ছেলে বনজিৎ স্কুল জীবন থেকেই হোস্টেলে, তবে তার মধ্যে কোন শনি-রবিবার যে ও হোস্টেলে কাটিয়েছে বলা শক্ত। একটা শনিবার না এলেই মা যা চেঁচামেচি লাগিয়ে দিত, ভয়ে ইচ্ছে না থাকলেও এসে হাজির হতে হত ওকে আমাদের বাড়ি, আমিই ক্লাসের পর নিয়ে আসতাম ধরে। আমার মা-বাবাকেও দু'বার যেতে হয়েছে দুটো পুজোর ছুটিতে ওদের বাড়ি। আর আমি তো এখানে কতবার এসেছি তার শেষ নেই।

আজও সেই বাড়িতেই আছি আমি, বনজিতেরই দোতলার ঘরখানায়—যেখানে দুজনে শুয়ে অনেক রাত অবদি গল্প করেছি বেশ কয়েকবার। কী আনন্দে কেটেছে সেই সব রাত, আর আজ—

ভাবতে পারছিলাম না আমি, মাথার শিরাগুলো দপদপ করছিল। গত মঙ্গলবারও যার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে, আজ শনিবার এসে যদি শুনি সে নেই, বিশ্বাস করতে সময় লাগে বৈকি। বিশেষ করে বনজিৎ আর আমি তো দুই ভায়ের চেয়েও অনেক বেশি, একজনকে ছাড়া আর একজনকে ভাবাই যায় না। সেই বনজিতের বিছানায় আমি শুয়ে অথচ বনজিৎ আর কখনই এসে আমার পাশটিতে শোবে না, একি ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করা যায়!

অথচ তাই হয়েছে। অত্যন্ত জ্বর নিয়ে ফিরেছিল বুধবার, বৃহস্পতিবার অবস্থা খারাপ হওয়াতে ভর্তি করা হয়েছিল সদর হাসপাতালে। মাঝরাত পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে যুঝেছিল বনজিৎ, তারপরই হঠাৎ হার্টফেল করে—

বাড়ির লোকজন তো মুহ্যমান বটেই, ডাক্তাররা পর্যন্ত হতবাক। জ্বর কমাবার হাজারটা ওষুধ আছে, অথচ একটা ওষুধও নাকি কাজ করেনি। সবচেয়ে আক্ষেপ তাঁদের, ঠিক কী জন্যে এতটা বাড়াবাড়ি হল সেটাই তাঁরা বুঝে উঠতে

পারেননি, রক্ত পরীক্ষা করে তার রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্তও তো সময় পাওয়া যায়নি। কেউ জানেন না অসুখটা কী, কিন্তু আমিও কি জানি না সেটা, সত্যিই জানি না কি!

কথাটা মনে হতেই সারা শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল!

কিন্তু না, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেই নিজে একটা ধমক মারলাম আমি। যে জিনিসের একটি ফোঁটাও আমি বিশ্বাস করি না, যার জন্যে একদিন লড়াই করেছি বনজিতের সঙ্গে এবং আজকেও শুধুমাত্র নিজের বিজয় ঘোষণা করতেই যখন সারাটা রাস্তা মহানন্দে আমি ছুটে এসেছি, তখন কাকতালীয় একটা ব্যাপারের জন্যে নিজের কাছে এরকম দুর্বল হয়ে পড়াটা একেবারেই ঠিক নয়। কবে একদিন একটা অশিক্ষিত তিব্বতী বুড়ো কী বলেছিল সেটাকেই যদি আজ সত্যি বলে ধরে নিই তাহলে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করে লাভ কী হল আমার! আজকের ছেলে বলে নিজেকে পরিচয় দেব কী করে!

কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই আমার ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, জিনিসটা কিন্তু এখনও তোমার ব্যাগের মধ্যেই আছে, বেশ বহাল তবিয়তেই আছে।

হ্যাঁ, আছে, আমি জানি। বনজিতের কথাটা শোনামাত্র মুহূর্তের দুর্বলতায় মনে হয়েছিল এক্ষুনি ছুটে গিয়ে সেটা বাইরে ফেলে দিয়ে আসি। কিন্তু তার সময়ও আমি পাইনি। রাত অনেকটাই বেশি হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য সেটা যে করিনি শেষ পর্যন্ত, সেটা ভেবে এখন একটু ভালোই লাগছিল আমার। হাজার হোক, একটা সংস্কারবদ্ধ ভীরু কাপুরুষ আমি নই অন্তত।

জিনিসটা আমার চোখের সামনে ভাসছিল, সেই সঙ্গে এম. এসসির সেমিস্টার পরীক্ষা দিয়ে দার্জিলিং যাবার দিনগুলোও।

ম্যালে ঘুরতে ঘুরতে কী খেয়াল হয়েছিল নীচে বহুদূরে লেবং রেসকোর্সকে একটা বালার মতো দেখতে লাগছিল—সেটা লক্ষ রেখেই অসমতল পাথরের চাঁই বেয়ে নামতে শুরু করেছিলাম, কেমন যেন একটা ট্রেকিংয়ের স্বাদ পাচ্ছিলাম। জোয়ান বয়সের দুটো ছেলে, বলবো কি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দার্জিলিংয়ের ওই ঠান্ডাতেও সমস্ত শরীর ঘামে জবজবে হয়ে উঠেছিল। সোয়েটার খুলে ফেলেছিলাম, জামা খুলতে পারলেও হয়তো ভালো লাগতো, কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না।

একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেটা ছিল তিব্বতী রিফিউজি ক্যাম্প। ছড়ানো-ছেটানো কিছু অস্থায়ী আস্তানা। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সবই আছে, দেখলেই বোঝা যায় অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। সেখানেই একটু খাবার জল সন্ধান করতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল বুড়োর সঙ্গে।

না, নাম মনে নেই, কিন্তু চেহারাটা মনে আছে খুব ভালো। মাথায় বটের ঝুরির মতো চুল, ফাঁকা ফাঁকা গোঁফদাড়িরও সেই অবস্থা। একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়ায়, তবু মনে হয় লম্বায় ছ-ফুটের কম হবে না। তামাটে রং, মুখে অজস্র মানচিত্র আঁকা। গেরুয়া রঙের দীর্ঘ জোব্বা, এটাই নাকি পুরোহিতের পোশাক। কেমন জল খাচ্ছি, স্বাস্থ্যকর কিনা, এসব ভাবার সময় তখন ছিল না—গলা শুকিয়ে খটখট করছিল। জল খেয়ে একটু বিশ্রাম নিতে নিতে মনে হচ্ছিল বড়ো গরিব লোকগুলো, একটু সাহায্য করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু এমনি তো আর টাকা দেওয়া যায় না, কিছু কিনতে চাই বলার পর বুড়ো ওদের হাতে তৈরি টুকিটাকি জিনিসপত্র দেখিয়েছিল, কিন্তু তাতে আমাদের কোনো দরকার ছিল না। অবশেষে বেরিয়েছিল

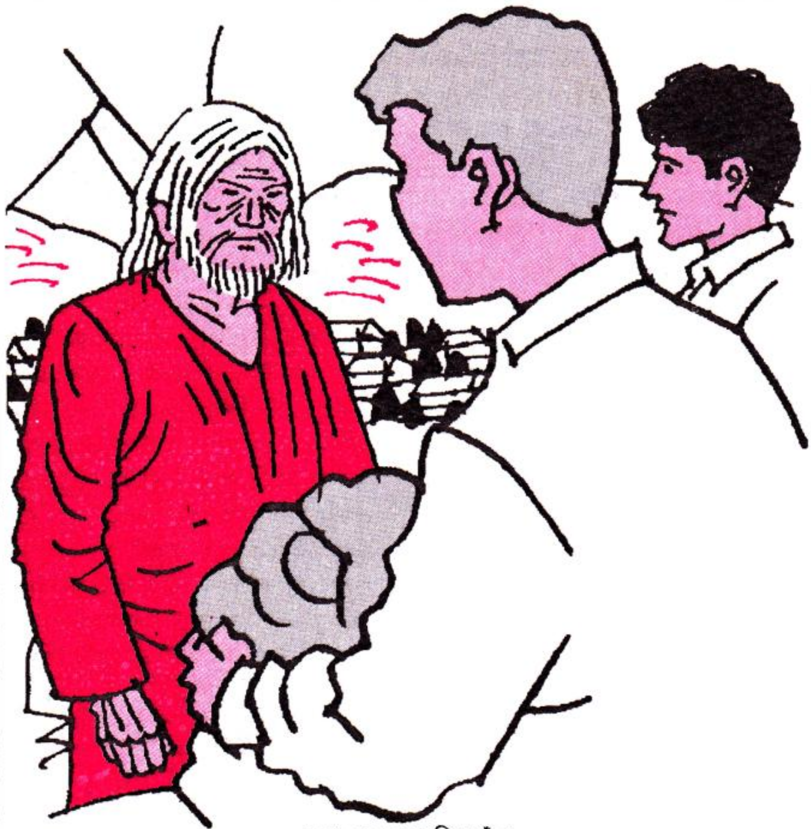

মুখে অজস্র মানচিত্র আঁকা

ওই জিনিসটি, রক্তমুখী ড্রাগন।

নামটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা আর একবার শিরশির করে উঠল আমার। জিনিসটা এখন আমার ব্যাগের ভেতর, তবু জ্বলজ্বল করে উঠল যেন আর একবার চোখের সামনে।

প্রায় গোলাকার ছোটখাট একটা চাকতি, আট ইঞ্চি মতো ব্যাস হবে। কিন্তু কী বীভৎস দেখতে চিন্তা করা যায় না। ড্রাগনের মুখ একটি, পেতল, ব্রোঞ্জ অথবা কোনো মিশ্রধাতুতে তৈরি। কুঞ্চিত এবং ভয়ংকর চোখদুটি লাল, আর মুখটিও লাল—মনে হচ্ছে নিশ্বাস দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। নামটা শুনে হাসি পেয়েছিল, ফ্রেন্ডশিপ ড্রাগন, বন্ধুত্বের ড্রাগন। অথচ বন্ধুত্বের কোনো চিহ্ন তার হাবভাবে কোথাও ছিল না।

তিব্বতী বুড়োও সেই কথাই বলেছিল আমাদের। অভিশপ্ত মূর্তি। তিব্বতের কোন গুম্ফায় নাকি ছিল। নামে ফ্রেন্ডশিপ হলেও এই ড্রাগনের কোপ নাকি পড়ে যার কাছে থাকে তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর ওপরই। আগে প্রিয় বন্ধুকে শেষ করে, তারপর যার কাছে আছে, তাকে। জানতো বলেই বুড়ো তার এই পারিবারিক সম্পত্তি ফেলেই আসতে চেয়েছিল সেখানে। কিন্তু নিজের নাতনির অতিপ্রিয় বান্ধবী কখন যে সেটিকে তার ঝুলিতে পুরে ফেলেছে বুঝতেও পারেনি সে। বুঝতে পারল যখন, তখন অত্যন্ত দেরি হয়ে গিয়েছে—দু-ঘণ্টার মধ্যে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে গিয়েছিল নাতনি। ড্রাগনের চোখ নাকি তখন আগুনের মতো জ্বলছিল, নিশ্বাসে হলকা বেরুচ্ছিল রীতিমতো। পরের দিন নাতনির সেই বান্ধবীকেও শেষ করে তবে সে শান্ত হয়েছে।

বনজিৎ একটু ভীতু ধরনের ছেলে, ওসব কথা শুনে বলেছিল, 'থাক না, কী হবে আর ওটা নিয়ে?'

আমি বলেছিলাম, 'থাকবে তো তোর কাছে! আমার কিছু হলে তখন না হয় ছুঁড়ে ফেলে দিস।'

'রক্ষে করো, ওসব বিদঘুটে জিনিস আমার কাছে রাখতে পারবো না আমি।'

'তাহলে আমিই রাখি'—আমি ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলেছিলাম, 'আজকের দিনের ছেলে হয়ে অন্তত এ কথা তুই বলিস না যে ওই কবেকার একটা পেতলের মূর্তি তোকে খুন করে ফেলবে।'

'না, সে কথা আমি বলিনি'—মন থেকে পুরো সায় যেন পাচ্ছিল না তবু, বলেছিল, 'বলছিলাম কী লাভ ওসব নিয়ে!'

'ভয়টা কাটানো হবে। বুকের ভেতর থেকে সংস্কারের বাসা অন্তত উপড়ে ফেলা যাবে।'

যে হাসিটা সেদিন আমার মুখে ছিল, সেটাই আমি দেখতে পেয়েছিলাম বনজিতের মুখে, যেদিন এম. এসসির রেজাল্ট বেরিয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল আমাদের বাড়ি। লফ্‌ট্ থেকে পেড়ে ধুলো ঝেড়ে মূর্তিটা আমি দেখিয়েছিলাম ওকে আবার, বলেছিলাম, 'তাহলে আমার এই ফ্রেন্ডশিপ ড্রাগন কিছুই করতে পারল না আমাদের।'

'তাই তো দেখছি।'

ভুলেই গিয়েছিলাম ওটার কথা। বহুদিন পরে মনে পড়ায় আবার ওটাকে টেনে বার করেছিলাম। একটা সারপ্রাইজ দেবো বলেই নিয়ে এসেছিলাম, ভেবেছিলাম ওকে বলবো, আমার কাছে থেকে তোর তো কোনো ক্ষতি করতে পারল না, এবার ক'দিন তোর কাছেই থাক, দেখ আমার কী ক্ষতি হয়—

তো, সে কথা আর বলার সুযোগ পাওয়া গেল না। তার আগেই আর-একটা কাকতালীয় ঘটনায় বেচারা বনজিৎকে চলে যেতে হল!

একটু জল খেলে হত। গলাটা শুকিয়ে গেছে। ঘুম যে আজ রাত্তিরে ভালো হবে না, সেটা জানতাম। সত্যি কথা বলতে কী, মাসিমা, মানে বনজিতের মা বারণও করেছিলেন আমাকে ওপরে শুতে, মানে বনজিতের ঘরে। বলেছিলেন, 'কী দরকার! নীচে আমরা সবাই আছি—'

আমি শুনিনি। প্রথমত কথাটার মধ্যে একটা ভয়-ভয় ভাব আছে, যেটায় আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না। দ্বিতীয় কথা, নীচে তেমন বিছানা-টিছানার ব্যবস্থাও নেই, বনজিতের ঘর থেকেই ওসব এনে নীচে পাততে হবে।

উঠতে যাচ্ছিলাম, একসঙ্গে দুটো ব্যাপার ঘটে গেল। খাটটা মোটামুটি জোরে একবার নড়ে উঠল। সেটা হতে পারে, আমি যখন নড়ছি, খাট তো নড়তেই পারে। কিন্তু আমি তো সবে একটু পাশ ফিরেছি, তাতে খাটটা এতো জোরে নড়বার তো কারণ নেই। দ্বিতীয় ব্যাপারটা আরো অদ্ভুত, ঠিক মনে হল আমার পাশে শুয়ে কেউ ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল—মানে আমি আর বনজিৎ পাশাপাশি শুলে যে ব্যাপারটা মাঝে মাঝে হয়েছে।

মুহূর্তের শঙ্কা। অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলে দিলাম মন থেকে। মশারিটা ফাঁক করে নামলাম মেঝেয়। কিন্তু টেবিলটা তো সামনেই ছিল, মানে যে টেবিলে রীতা, বনজিতের বোন, জলের বোতলটা রেখে গিয়েছিল। কোথায় গেল টেবিলটা!

দু'বার হাতড়ালাম সামনেটা, কিছুই ঠেকল না হাতে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘর। অথচ স্পষ্ট মনে আছে কিন্তু আমার, রীতা যাবার সময় হালকা বেডল্যাম্পটা জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিল। ল্যাম্পটা কি কেটে গেল তাহলে! হতে পারে।

আন্দাজে আন্দাজে পা বাড়ালাম। সামনে দরজা আছে জানি, তার পাশেই সুইচবোর্ড। বুকটা যে একটু ধড়াস ধড়াস করছিল না তা নয়, অন্ধকার ঘরে রাতদুপুরে এ রকম করতেই পারে। তার ওপর এসেই যেসব বিশ্রী কথা শুনেছি, তাতে আর—

দেওয়াল ঠেকল হাতে। একটু ডান দিক সরে আসতে সুইচবোর্ডও পেলাম। আন্দাজে যে কটা সুইচ পেলাম পর পর টিপে গেলাম।

হায় কপাল, তাই বলো! লোডশেডিং!

ওই জন্যেই এত অন্ধকার লাগছে ঘরটা। জানলা তো একটা খুলেই শুয়েছিলাম, অথচ একটু আলোর রেখাও কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

কী করবো কিছু বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল টর্চটা তো আমার ব্যাগের মধ্যেই আছে। কিন্তু ব্যাগটা যে এনে কোথায় রেখেছিলাম! ঠিক, ঘরের কোণে, মেঝের ওপর। একটা পায়জামা বার করে পরেছিলাম, ওটা আর তোলা হয়নি টেবিলে।

তার মানে ব্যাগটা পেতে গেলে আমাকে আরো খানিকটা ডান দিকে এগুতে হবে, একেবারে ঘরের কোণ-বরাবর। তাই যেতে হবে, উপায় কী! অন্তত একটু আলো হলে খুঁজে দেখা যাবে বনজিতের টেবিলে মোম-টোম কিছু আছে কিনা।

আস্তে আস্তেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কী যেন একটা গলা ছুঁয়েই বেরিয়ে গেল।

কী হতে পারে! ঠান্ডা একটা আঙুল? টিকটিকি! নাকি—

কী তা জানি না, কিন্তু এরকম হাড়-হিম-করা ঠান্ডা স্পর্শ কিসের হতে পারে আমার মাথায় ঢুকছিল না। সেটা নিয়ে অবশ্য চিন্তা করারও অবকাশ পেলাম না বিশেষ, কারণ তার আগেই ঘাড়ের কাছে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল কেউ।

বরফের মতো ঠান্ডা। এক খাবলা বরফজলই যেন ছুঁড়ে মেরেছে ঘাড়ে আমার।

এবার মাথাটা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসছিল আমার। ঘরে আমি ছাড়াও কেউ আছে, আমার মনে হচ্ছিল। অথচ তার যে একটা সাড়া নেব, তার উপায় ছিল না, গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুচ্ছিল না আমার।

দাঁড়িয়েই পড়েছিলাম বোধহয় চুপ করে। একটু মাথাটা স্থির করে নিয়ে মনে হল, টর্চটা আমায় বার করতেই হবে। একবার আলো জ্বালতে পারলে বোধহয় এসব অস্বস্তি আর ভয়ঙ্কর ব্যাপারের হাত থেকে মুক্তি পাবো। অন্তত আমি দেখতে পাবো ঘরে কেউ আছে কিনা। এই ভাবে একটা আতঙ্কের মধ্যে তো বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না।

পায়ে আর জোর ছিল না আগেকার মতো। তবু অশক্ত পা টানতে টানতে

চিড়িয়াখানার মানুষ মা ৫০.০০

বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গরাদের আড়ালে থাকা বাঘ-সিংহ দেখা নিছক বিনোদন নয়। চিড়িয়াখানার ধারণাটাই বদলাচ্ছে দ্রুত। পরিবেশিত প্রতিটি নিবন্ধ নির্জলা সত্য।

বাঘের ছানাকে ছেলের মতো পালন করছেন মানুষ মা। ক্যারল নামে একটি হাতি রঙ আর বুরুশ পেলেই ছবি আঁকে। আবার অসতর্ক মানুষের হাত থেকে ডলার ছিনতাই করে গোলাপি কাকাতুয়া। কেনই বা এত রহস্য ব্ল্যাক প্যান্থারকে ঘিরে। ব্রুকের হাতে ফিডিং বোতল দেখলেই ভারি মিহি গলায় ডেকে ওঠে চিতাবাঘের বাচ্চাগুলি। মনমরা শিম্পাঞ্জি শিশুর একাকিত্ব দূর করতে তার সঙ্গে ব্রুককে অনর্গল কথা বলতে হয়। কম যায় না রিং-টেইল লেমুরের দল। ব্রুককে দেখলেই তারা ঘিরে ধরে। আবদার, বাদাম খাবে। বাদাম তাদের দিতেই হবে। না দিয়ে কী থাকতে পারে ব্রুক! সে যে চিড়িয়াখানার মানুষ মা। অবিশ্বাস্য মনে হলেও পুরোপুরি সত্য সব কাহিনিতে ভরা বইটি ছোট-বড় সকলকে রোমাঞ্চিত করবে, চিড়িয়াখানার বাসিন্দাদের নতুন করে চেনাবে। বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই এই প্রথম।

দেব সাহিত্য কুটীর

২১, ঝামাপুকুর লেন ❑ কলকাতা-৯

আন্দাজে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম ঘরের কোণের দিকে। বুকের মধ্যে হাপর চলছিল, কিন্তু আমি থামিনি, ব্যাগের কাছে আমাকে পৌঁছতেই হবে, টর্চটা আমায় বার করতেই হবে। নইলে এই ভয়ংকর আতঙ্কের হাত থেকে আমার রেহাই নেই।

পা ঘষে ঘষে প্রায় পৌঁছে গিয়েছি ঘরের কোণে, ব্যাগে আমার একটা পা সবে ঠেকেছে, ঠিক সেই সময়েই আর একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

ঠিক কী যে হল, সেটা বোঝার আগেই আমি ছিটকে পড়েছি ঘরের মেঝেয়। সমস্ত শরীর আমার অবশ হয়ে গিয়েছিল। মাথার ভেতর শিরাগুলো ছিঁড়ে যাবার মতো যন্ত্রণা। কিছু চিন্তা করার মতো শক্তিও আমার ছিল না।

ওরই মধ্যে মাথা যখন সামান্য কাজ করছিল, আমি বুঝতে পারছিলাম, খোলা তারে হাত দিলে যেমন ইলেকট্রিক শক খায়, আমার পা ব্যাগে ঠেকার সঙ্গে সঙ্গে সেই রকম একটা শক খেয়েছি আমি। আমাকে ছিটকে ফেলে দিয়েছে মাটিতে।

এই প্রথম ভয়ের একটা তীব্র অনুভূতি উঠে আসছিল আমার ভেতর থেকে। এসব নিয়ে কখনই ভাবি না, কিন্তু মনের মধ্যে যে ভাবনা লুকিয়ে থাকে, তাতেই বোধহয় ভাবছিলাম বনজিতের অতৃপ্ত আত্মা আমার সঙ্গ চাইছে, আমার পাশে থেকে সে আমার সান্নিধ্য অনুভব করতে চাইছে। কিন্তু এই মুহূর্তে যেটা ঘটে গেল সেটার মানে তো আরো সাঙঘাতিক। এর সঙ্গে বনজিতের তো কোনো সম্পর্কই নেই।

আমি যে ঠিক চিন্তা করছিলাম এমন নয়, কিন্তু একটা অস্ফুট চিন্তা চারদিক থেকে আমায় যেন জড়িয়ে ধরছিল। আমার হঠাৎই মনে পড়ে যাচ্ছিল রক্তমুখী ড্রাগন কেবল বন্ধুকে নৃশংস ভাবে মেরে ফেলে সন্তুষ্ট হয় না, তারপরেই সে আক্রমণ করে যার কাছে সে আশ্রয় নিয়েছে তাকে। ড্রাগন এত দিন পরে আমার প্রিয়তম বন্ধুকে সরিয়ে দিতে পেরেছে পৃথিবী থেকে, দেরি করে হলেও শেষ পর্যন্ত সে পেরেছে। একবার রক্তের স্বাদ পেয়ে গিয়েছে, এবার তার দ্বিতীয় শিকার—

নিজেকে বাঁচাবার একটা মরিয়া চেষ্টাই যেন ঠেলে তুলে দিল আমাকে!

বেরিয়ে যেতে হবে এই ঘর থেকে। দরজা কোথায় আছে আমি জানি, একবার ছিটকিনি খুলতে পারলেই বেঁচে যাবো আমি। সিঁড়ি দিয়ে সোজা নীচে, আর তারপরই ওদের ডেকে তুলে—

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম দরজার দিকে। ধাক্কা খেলাম দেওয়ালে। দরজা খুঁজে পাইনি আমি।

পড়ে যাচ্ছিলাম, টাল সামলে নিলাম। দ্বিতীয় বারের প্রচেষ্টা শুরু করার আগেই আবার—

ঘাড়ের কাছে সেই হাড়-হিম-করা নিশ্বাস!

রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে আসছিল আমার শরীরে। কোনো রকমে নিজেকে খাড়া রেখে এবার পাগলের মতো ছুটে বেড়াতে গেলাম এদিকে-ওদিকে। ধাক্কা খাচ্ছি, পায়ে লাগছে, মাথা ঠুকে যাচ্ছে— কিছুই খেয়াল নেই আমার। একটাই মাত্র চিন্তা আমার মাথায়, দরজার কাছে আমাকে পৌঁছুতে হবে, ছিটকিনি আমায় খুলতে হবে, বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে ঘর থেকে। শেষ পর্যন্ত বুঝি কোন অলৌকিক উপায়ে দরজার কাঠের ওপর হাত ঠেকেছে আমার। যে মুহূর্তে ছিটকিনির দিকে হাতটা উঠিয়েছি, ছিটকিনিটা নামিয়েছি নীচে—

সাপের মতো একটা হিলহিলে লম্বা জিনিস আছড়ে পড়েছে আমার ঘাড়ে, গলায়। পেঁচিয়ে ধরেছে আমার গলা।

আমি দু'হাত দিয়ে ঠেলে সরাতে চাইছি তাকে, পারছি না। বরফ-হিম স্পর্শ বরং আরো এঁটে বসছে আমার গলায়। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। শরীরের সব জোর ফুরিয়ে আসছে আমার। শেষবারের মতো দেহের সমস্ত জোর দিয়ে সরাবার চেষ্টা করলাম একবার সেটাকে, পারলাম না।

থরথর করে কাঁপছিল শরীর। সেখানেই আছড়ে পড়ে গেলাম আমি।

চোখ খুলতে আমার ভয় করছিল। চোখ খুলে বুঝতে পারলাম, আমি মরিনি। শুধু মরিনি যে তা নয়, আমাকে ঘিরে রয়েছেন সবাই—বনজিতের মা, বাবা, বোন, সকলে। আমি শুয়ে আছি বনজিতের খাটে, মানে রাতে আমি যেখানে শুয়েছিলাম।

পিটপিট করে তাকাচ্ছিলাম, বনজিতের বাবা বললেন, 'তুমি ভয় পেয়েছিলে বাবা রাত্তিরে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। আমারই উচিত হয়নি একা একা তোমাকে ওপরে শুতে পাঠানো। হাজার হোক তোমার একেবারে প্রাণের বন্ধু। এতবড় শক্‌টা তুমি কি এতো চট করে সহ্য করে নিতে পারো!'

কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিলাম, উনিই আবার বললেন, 'লোডশেডিং হয়েছিল রাত্তিরে। সেইজন্যেই বোধহয় তুমি দিক ঠিক করতে পারোনি। তবে ঈশ্বরের অসীম দয়া যে তুমি ছিটকিনিটা খুলতে পেরেছিলে, সেই জন্যেই দড়াম করে তোমার পড়ে যাবার শব্দ শুনে আমরা ছুটে এসে ঘরে ঢুকতে পেরেছিলাম।'

'ঘরে আর কেউ, মানে—'

'না না, আর কেউ আসবে কোত্থেকে! ওই ছিটকিনির সঙ্গেই মশারির দড়িটা বাঁধা ছিল তো, সেটাই জড়িয়ে গিয়েছিল তোমার গলার সঙ্গে। যাক গে, তোমার জ্ঞান হয়েছে, এই আমাদের ভাগ্য। তুমি একটু রেস্ট নাও, ডাক্তারবাবুকে খবর দিই, তিনি এসে একবার দেখে যান।'

চলে গেলেন সবাই। গলায় একবার হাত দিলাম আমি। ব্যথা হয়ে আছে গলাটা। মশারির দড়ি! কে জানে!

ওঠার চেষ্টা করলাম। মাথাটা ঘুরছে বেশ। শরীরের জোর নেই তেমন। আস্তে আস্তে আমার ব্যাগের কাছে গেলাম। চেনটা টেনে হাত ভরে দিলাম ভেতরে।

মাথাটা দ্বিতীয়বার শিরশির করে উঠল। জিনিসপত্র টেনে বার করলাম।

না, ঠিকই আন্দাজ করেছি। রক্তমুখী ড্রাগনটা আমার ব্যাগে নেই আর এখন।

ছবি ঃ বিজন কর্মকার

খাঁড়ি-রহস্য

সঙ্কর্ষণ রায়

আমার সহকর্মী ও দাদা-কাম-বন্ধু গোপীনদা (গোপীন ব্যানার্জি) ১৯৮৪ সালে মার্চ মাসের 'একদিন সকালে তাঁর সমুদ্র-বিজ্ঞান (মেরিন জিয়োলজি) বিভাগের দপ্তরে ডেকে পাঠালেন আমাকে। তাঁর কামরায় ঢুকে মধ্যবয়সী একজন মহিলাকে দেখতে পেলাম। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে গোপীনদা বললেন, তুমি তো গুজরাটের লিগনাইট ডিপোজিটগুলো পরীক্ষা করার জন্য ওখানকার কোস্টাল এরিয়ায় ঘোরাঘুরি করবে, মিসেস যশোধরা প্যাটেল তোমার সঙ্গে যাবেন।

তিনি কি গুজরাটের লিগনাইট ডিপোজিট সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড? আমি প্রশ্ন করলাম।

না, তিনি তাঁর ছেলে দুর্জয় প্যাটেলের সন্ধান নেবেন।

কিন্তু দুর্জয় তো গত তিন মাস ধরে নিখোঁজ, গুজরাট সার্কলের জিয়োল-জিস্টরা অনেক খুঁজেও তাকে পায়নি....

আমি ছাড়া কেউই পারবে না তাকে খুঁজে বের করতে। যশোধরা বললেন, আমি যাব আপনার সঙ্গে, আমার বিশ্বাস আমিই পারব তাকে খুঁজে বের করতে।

আমাদের ডিরেক্টর জেনারেল আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, গুজরাট সার্কলের ডিরেক্টর সম্প্রতি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, দুর্জয় বেঁচে নেই, গুজরাটের উপকূলে একটি খাঁড়ির মধ্যে সে দুর্ঘটনার বলি হয়েছে। কিন্তু দুর্জয়ের মা যশোধরার বদ্ধমূল ধারণা সে বেঁচে আছে। আমাদের খনিজ ও খনি বিভাগের মন্ত্রীকে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন। সম্ভবত তিনি প্যাটেল পরিবারের পারিবারিক বন্ধু। মন্ত্রী আমাকে যশোধরার সঙ্গে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করেছেন এবং খোঁজাখুঁজিতে তাঁকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আমরা বিমানে মুম্বাই হয়ে আমেদাবাদ যাব। যাত্রার আগের দিন রাত্রে যশোধরা গাড়ি পাঠিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর ম্যান্ডেভিল গার্ডেনের বাড়িতে। শোবার ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, দুর্জয় রোজ রাত্রে এই ঘরে আমার সঙ্গে আলাপ করে।

টেলিফোনে? আমি প্রশ্ন করি।

না। রোজ মাঝরাতে এই ঘরের মধ্যে সোচ্চার হয়ে ওঠে তার গলার স্বর, কিন্তু আমি ছাড়া বাড়ির কেউ-ই পায় না শুনতে। তাকে বেতার-বার্তা বলা যায় কি?

বোধহয় না। কারণ বেতার-বার্তা হলে তা বেতার-যন্ত্রের মধ্য দিয়ে শোনা যেত এবং বাড়ির সকলেই শুনতে পেত।

প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার দূরে গুজরাটের সমুদ্র-উপকূলের একটি খাঁড়ির মধ্যে থেকে সে আমাকে ডাকছে এবং আমার ঘরে আমার কাছে তার ডাক এসে পৌঁছাচ্ছে, এই ব্যাপারটাকে টেলিপ্যাথি বলা যায় কি?

জানি না। টেলিপ্যাথি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা বা অভিজ্ঞতা নেই।

রোজ রাতে দুর্জয়ের ডাক শুনি। ব্যাকুল হয়ে সে তার কাছে যাবার জন্য ডাকে। মা হয়ে তার ডাক আমি উপেক্ষা করি কি করে বলুন?

আপনাকে ডাকছে কিন্তু বলছে না কোথায় আছে। কোথায় আছে না জানলে

যাবেন কি করে তার কাছে?

এখন না বললেও যথাসময়ে বলবে কোথায় আছে সে। আমার মনে হয়, আমি ভারুচ বা বদোদরায় গেলেই বলবে সে।

দমদম বিমানবন্দরে মুম্বাই ফ্লাইটের ফ্লাইট কার্ড নিতে নিতে দুর্জয়ের সঙ্গে গভীর রাতে তাঁর শেষ আলাপের কথা আমাকে বললেন যশোধরা। তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস আমরা আমেদাবাদ পৌঁছবার আগেই সে জানিয়ে দেবে কোথায় আছে সে। ২২ মার্চ সকাল দশটায় পৌঁছই মুম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে। যশোধরার একটি ফ্ল্যাট আছে আন্ধেরিতে, তাঁকে নিতে এসেছিল তাঁদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের একটি গাড়ি। আমি যাই দাদারে আমার বোন ও ভগ্নীপতির ফ্ল্যাটে।

আমেদাবাদ যাত্রার দিন যশোধরা নিজে ঠিক করবেন বললেন। দুর্জয়ের কাছ থেকে সে কোথায় আছে জানার পরই নাকি আমাদের যাত্রা শুরু হবে। কিন্তু আন্ধেরির ফ্ল্যাটে দুর্জয় দেখা দেয় না। মুম্বাই থেকে আমেদাবাদগামী বিমানের জনৈক বৈমানিকের সঙ্গে যশোধরার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। তাঁর সঙ্গে দেখা করে যশোধরা জানলেন যে আমেদাবাদগামী বিমান গুজরাটের উপকূলের ওপর দিয়ে যায়। শুনেই তাঁর মনে হল, বিমানে করে আমেদাবাদ যাবার পথে বিমান যখন গুজরাটের উপকূলের ওপর দিয়ে যাবে, তখনই দুর্জয় দেখিয়ে দেবে সে কোথায় আছে।

বৈমানিকের কাছ থেকে যশোধরা আরও জানলেন যে, ২৭ মার্চ-এর ফ্লাইটে তিনিই ক্যাপ্টেন। তাই এই বিমানেই যাবেন ঠিক করলেন যশোধরা। কর্তৃপক্ষের আদেশে আমার তাঁর সঙ্গে যাওয়া বাধ্যতামূলক, কাজেই এই বিমানে আমিও যাত্রার ব্যবস্থা করি।

২৭ মার্চ বিকেল পাঁচটায় সান্তাক্রুজ বিমানবন্দর থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। বিমানে উঠতে গিয়ে দেখি যে সেটা বোয়িং ৭৩৭ নয়, ছোট আকারের ফকার ফ্রেন্ডশিপ। যশোধরা খুশি, কারণ ফকার ফ্রেন্ডশিপ বোয়িং-এর তুলনায় বেশি উঁচুতে উঠতে পারে না। ভূপৃষ্ঠ থেকে অপেক্ষাকৃত অল্প উচ্চতা দিয়ে উড়ে যাবে। ফলে যে খাঁড়ির মধ্যে দুর্জয় আছে, তা তাঁকে দেখিয়ে দেবে।

বিমানবন্দর থেকে আকাশে উঠতেই নীচে সমুদ্র ও শহরের বিস্তীর্ণ ছবি ফুটে ওঠে। মুম্বাই যেন একটা খেলনানগরী, তার মধ্যে মানুষ ও বাস-ট্যাক্সি-মোটর যেন পুতুল ও দম দেওয়া গাড়ি। পশ্চিমঘাট পাহাড় কয়েকটি কালো রঙের পাথর দিয়ে তৈরি ঢিবি, দেখে মনে হচ্ছে কোনো অদৃশ্য খেলুড়ে নীল সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের কোলে পুতুল খেলছে।

বিমান ওড়ে আরব সাগরের তীর অনুসরণ করে উত্তর অভিমুখে। নদী যেখানে সমুদ্রে মিশেছে, নদী-সমুদ্রের সঙ্গমে অনেকগুলো খাঁড়ি চোখে পড়ল। এক নদী অনেক খাঁড়ি সৃষ্টি করেছে সমুদ্রতীরের পাথরের স্তর বিশ্লিষ্ট করে। আমার পাশে বিমানের জানলার ধারে বসে যশোধরা একদৃষ্টে দেখছিলেন নীচের দৃশ্য, তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি পাইলটের কাছে কক্‌পিটে যাব।

এয়ার-হোস্টেসদের বারণ না মেনে সামনে কক্‌পিটের দিকে এগিয়ে যান যশোধরা। কক্‌পিটের বন্ধ দরজার কাছে তিনি পৌঁছতেই দরজা খুলে স্বয়ং ক্যাপ্টেন বেরিয়ে এসে তাঁকে নিয়ে যান কক্‌পিটের ঘেরাটোপের মধ্যে।

যশোধরা কক্‌পিটে ঢুকতেই বিমান তীর থেকে পশ্চিম দিকে সমুদ্রের ওপর দিয়ে ওড়ে। তীর অদৃশ্য হয়ে যায়, আকাশের নীলিমা সমুদ্রের নীলিমার সঙ্গে মেশে, আকাশ ও সমুদ্র একাকার হয়, ওপরে-নীচে ডাইনে-বাঁয়ে সর্বত্র যেন আকাশ ছাড়া আর কিছুই নেই।

মিনিট দশেক ধরে আকাশ ও সমুদ্রের নীলিমার মধ্যে অবগাহন করার পর বিমান তীরে ফিরে আসে। গন্তব্য আমেদাবাদ আর বেশি দূর নয়, বিমান নীচের দিকে কিছুটা নেমে পড়ে। স্পষ্টতর হয়ে ওঠে নদী-সমুদ্রের সঙ্গমে খাঁড়িগুলোর বিচিত্র বিন্যাস। ছোট-বড় কয়েকটি নদীর মধ্যে সবচেয়ে বড় নদী নর্মদাকে চিনে নিই। নর্মদা যেখানে আরব সাগরে মিশেছে, সেখানে বৃহদায়তন খাঁড়িকে ছোটখাটো উপসাগর বলে মনে হয়। সমুদ্র এখানে অবশ্য কাথিয়াওয়াড় ও গুজরাটের অবশিষ্ট ভূখণ্ডের মাঝখানে উপসাগরের রূপ নিয়েছে, যার নাম কাম্বে বা খাম্‌ভাট্‌ উপসাগর।

একটি খুব গভীর খাঁড়ি দেখতে পেলাম নর্মদা-সঙ্গমের উত্তরে সমুদ্রের উপকূলে। একটি ছোট নদী সমুদ্রে এসে পাথরের স্তর বিশ্লিষ্ট করে সৃষ্টি করেছে এই খাঁড়ি। ভূবিজ্ঞানীর চোখে এই খাঁড়িটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য, সবিশেষ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দাবি রাখে। ভারুচে লিগনাইট দেখতে গিয়ে এই খাঁড়িতে পরীক্ষা- নিরীক্ষার কথা ভাবি। স্থানীয় কোনো ভূবিজ্ঞানী ওখানে যাবার ব্যাপারে হয়তো সাহায্য করতে পারবেন আমাকে। যশোধরা তাঁর ছেলের খোঁজে হয়তো ওখানেই যাবেন আমাকে নিয়ে।

আমেদাবাদ বিমানবন্দরে ক্যাপ্টেন নারায়ণ দেশাইয়ের হাত ধরে বিমান থেকে নেমে এলেন যশোধরা। উত্তেজিত স্বরে বললেন, দুর্জয়কে স্পষ্ট দেখেছি। নর্মদা নদীর উত্তরে ও সবরমতী নদীর দক্ষিণে একটি ছোট নদী সমুদ্রে এসে খুব গভীর একটা খাঁড়ি তৈরি করেছে, সেই খাঁড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে সে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল।

দেখতে পেয়েছিল সে আপনাকে? আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

নিশ্চয়ই। দেখতে পেয়েছিল বলেই ডাকছিল। চলুন যাই তার কাছে। মিস্টার দেশাইও যাবেন বলেছেন আমাদের সঙ্গে।

তাই নাকি? মিস্টার দেশাই, আপনি কি দেখতে পেয়েছেন দুর্জয়কে?

দুর্জয়কে নয়, নদীর খাঁড়িটাকে দেখেছি, নারায়ণ দেশাই বললেন। চোখে পড়ার মতো গভীর খাঁড়ি, ম্যাপে তার লোকেশন চিহ্নিত করে নিয়েছি।

খাঁড়িটা আমারও চোখে পড়েছে, আমি বললাম, কিন্তু ওখানে পৌঁছতে হলে স্থানীয় জিয়োলজিস্টদের সাহায্য

দরকার।

অবশ্যই দরকার। জিপ ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি করে ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়, জিপের ব্যবস্থাও করতে হবে।

হয়ে যাবে ব্যবস্থা। এখানকার সার্কল অফিসের ডিরেক্টরই করে দেবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তো তা সম্ভব নয়, আপাতত মিসেস প্যাটেলকে আমি তাঁর এখানকার বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করতে বলি।

আপনিও চলুন আমাদের বাড়িতে, যশোধরা আমার উদ্দেশে বললেন। নারায়ণভাই তো আমেদাবাদে এলে আমার বাড়িতেই থাকেন।

আমি আমার ভাগ্নে শঙ্কর দাশগুপ্তের বাড়িতে থাকব, আমি বললাম।

ইতিমধ্যে শঙ্কর এসে হাজির হয়েছে আমেদাবাদ বিমানবন্দরে আমাকে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যশোধরা ও নারায়ণ দেশাইয়ের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিই।

যশোধরা বললেন, ঠিক আছে, আপনি নিয়ে যান আপনার মামাকে, কিন্তু যাবার আগে আপনার ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে দিয়ে যান আমার নোটবইতে.....

বলে যশোধরা তাঁর ব্যাগ থেকে তাঁর নোটবই বের করে এগিয়ে দিলেন শঙ্করের দিকে। শঙ্কর তার পকেট থেকে তার নাম-ঠিকানা ছাপা কার্ড বের করে যশোধরার নোটবইয়ের মধ্যে গুঁজে দিল।

থ্যাঙ্ক ইউ, বলে যশোধরা তাঁর ব্যাগ থেকে তাঁর স্থানীয় ঠিকানা ও ফোন নম্বর যুক্ত কার্ড বের করে আমাকে দিয়ে বললেন, ভাগ্নে ও ভাগ্নে-বৌয়ের আতিথেয়তায় মগ্ন হয়ে আমার কথা ভুলে যাবেন না যেন।

ভুলে গেলে ডিরেক্টর জেনারেল ও মন্ত্রী দুজনেরই যুগ্ম খড়্গ আমার ঘাড়ে এসে পড়বে, আমি বললাম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিসেস প্যাটেল, কাল সকালেই যোগাযোগ করব আমাদের এখানকার সার্কল অফিসের ডিরেক্টরের সঙ্গে। আপনি চান তো আপনাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি ডিরেক্টরের অফিসে।

অবশ্যই নিয়ে যাবেন, আমি আপনার সঙ্গে না গেলে এখানকার সার্কলের ডিরেক্টর হয়তো ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেবে না।

সবরমতী নদীর ধারে সবর হোটেলের কাছে সবর অ্যাপার্টমেন্টের দশতলায় শঙ্করের ফ্ল্যাট। সেখানে তার স্ত্রী ইন্দ্রাণী, মেয়ে টুকাই ও দুই যমজ ছেলে অর্ঘ্য ও শংখ আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। ছেলে-মেয়ে ছাড়া কুকুর কালু ও টিয়া-পাখি নিয়ে তাদের সংসার।

পরদিন সকালে টিয়াপাখি ও ইন্দ্রাণীর ডাকে আমার ঘুম ভাঙে। ভোরের বেড-টি আমার খাটের পাশে টুলে রেখে ইন্দ্রাণী বললে, মিসেস যশোধরা প্যাটেল ফোন করেছিলেন, তিনি বললেন যে, সকাল দশটায় সোজা জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অফিসে যাবেন তিনি, আপনার তুলে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই।

সকাল নটায় এসে গেল জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার স্থানীয় সার্কল অফিসের ডিরেক্টরের গাড়ি। ড্রাইভার বললে যে, ডিরেক্টর সাহেব অফিসে পৌঁছেই আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর দপ্তরে নিয়ে যেতে বলেছেন, খুবই জরুরি ব্যাপার। প্রাতরাশ খেয়ে তৈরি হয়ে আমি গাড়ির জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, তাই বেরোতে একটুও দেরি হয় না।

ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকতেই তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, মিসেস যশোধরা প্যাটেল আসার আগে আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। নর্মদা, মাহি, সবরমতী এবং আরও কয়েকটা নদী যেখানে সমুদ্রে মিশেছে সে সব জায়গায় রীতিমতো গভীর খাঁড়ির সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে এই সব খাঁড়ি পরীক্ষা করছিল দুর্জয়। পরীক্ষা করতে করতে সে খাঁড়িগুলোর মধ্যে পরিবর্তনের আভাস পেয়েছিল। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে আমেদাবাদে এসে

দেব সাহিত্য কুটীরের সবরকম বই-এর প্রাপ্তিস্থান ঃ

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

দেব লাইব্রেরী
১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

চক্রবর্তী চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

অক্সফোর্ড বুক স্টোর
১৭, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

ল্যান্ডমার্ক
৩, লর্ড সিনহা রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১

বিংশ শতাব্দী
৭৫ সি, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

শ্রাবন্তী বাসন্তী বুক স্টল
দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা-৭০০ ০২৮

বি. কে. বুক স্টল
শিয়ালদহ

কালচার বুক সেলার্স
শপ নং ৪৭ অফ লোকাল সেন্টার
ইন ব্লক আই-এ, সেক্টর-২
পূর্বাচল (ট্যাংক-১৩), বিধাননগর,
কলকাতা-৭০০ ০৯১

স্টাডি
যাদবপুর সি আই টি মার্কেট,
কলকাতা-৭০০ ০৩২ ও
৮ কে ব্রজমোহন মণ্ডল রোড
সন্তোষপুর লেক (দঃ), কলকাতা-৭০০ ০৭৫

আর্টস কলেজ ইউনিট
যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, যাদবপুর-৭০০ ০৩২

আই এস পি সি কে
৫১, জওহরলাল নেহরু রোড, কল-১

চার্নক সিটি (সল্ট লেক)
কে বি ২৬, কলকাতা-৭০০ ০৯১

চার্নক সিটি (টালিগঞ্জ)
৫, এন এস সি বোস রোড, কল-৪০

ক্রস ওয়ার্ড
৮, এলগিন রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০

এটসেটেরা
শপ নং ৪৫ (সন্তোষপুর)
১০৫০/১ সার্ভে পার্ক, কলকাতা-৭৫

মিত্র লাইব্রেরী
৭ নং চণ্ডী ঘোষ রোড, কলকাতা-৪০

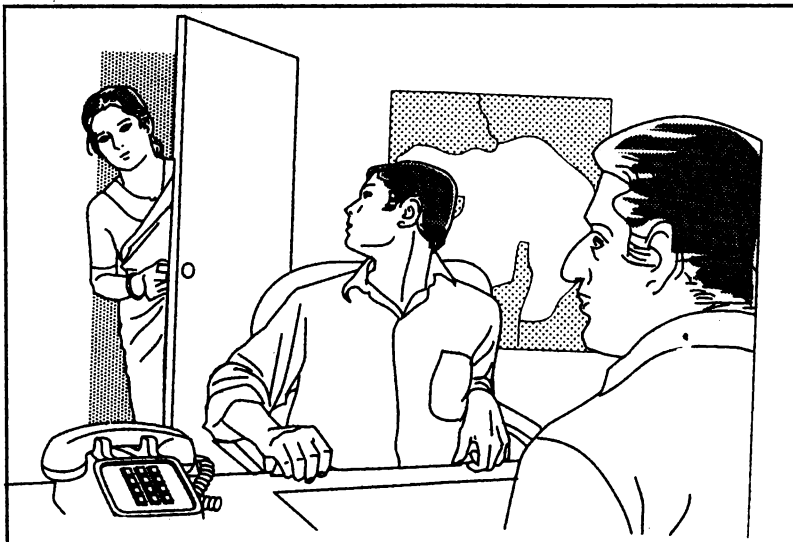

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন

সে আমাকে বলেছিল যে, মাহি ও সবরমতী নদীর খাঁড়ি দুটির গভীরতা নাকি ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু এতই অল্পস্বল্প করে বেড়ে চলেছে যে, তা চোখে দেখে বোঝা যায় না। বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে খাঁড়িগুলোর গভীরতা বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করার কথা ছিল তার গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে। কিন্তু হঠাৎ উধাও হয়ে গেল সে। তার সঙ্গে তার গাইড পূরণচাঁদও নিখোঁজ হল। খাঁড়িগুলোর মধ্যে ঢুকে যারা মাছ ধরে তাদের দিয়ে নর্মদা থেকে সবরমতী পর্যন্ত খামভাট উপসাগরের তীরে প্রত্যেকটি খাঁড়ির মধ্যে তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি করিয়েছি, কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি তাদের। খুব সম্ভব হাঙর বা অন্য কোনো রাক্ষুসে সমুদ্রের জন্তুর খপ্পরে পড়েছে তারা। মানে সেফালোপোড জাতীয় কোনো জানোয়ার।

আমি বললাম, এ সব কথা মিসেস প্যাটেলকে বলে কোনো লাভ নেই, কারণ তাঁর ছেলে দুর্জয় রোজই তাঁকে দেখা দিচ্ছে, প্লেন থেকে একটা খুব গভীর খাঁড়ির মধ্যে তাকে দেখেছেন তিনি।

নিজের মৃত ছেলেকে দেখছেন তিনি! তাঁর হ্যালুসিনেশন তাঁকে টানছে বলে তিনি আমাদেরও টেনে নিয়ে যেতে চান! তিনি একজন উচ্চবিত্ত প্রভাবশালিনী মহিলা। আমাদের পক্ষে মর্মান্তিক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মন্ত্রী ও ডিরেক্টর জেনারেলের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে তিনি তাঁর হ্যালুসিনেশনের পেছনে আমাদের দৌড় করাচ্ছেন।

কী আর করা যাবে বলুন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমি বললাম। তাঁর এই অবসেশনের দরুন তিনি ও আমি দুজনেই হয়তো রাক্ষুসে হাঙর বা সেফালোপোডের খাদ্য হতে চলেছি।

নিবৃত্ত করতে হবে তাঁকে। উত্তেজিত স্বরে গুজরাট সার্কলের ডিরেক্টর বললেন, আমি ভাবছি একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে ডেকে এনে......

এমন সময় বেয়ারা এসে যশোধরা প্যাটেল ও নারায়ণ দেশাইয়ের আগমন সংবাদ দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডিরেক্টরের বিনা অনুমতিতেই ঘরে ঢুকলেন যশোধরা ও নারায়ণ। যশোধরা বললেন, কিছু মনে করবেন না ডিরেক্টর সাহেব, আপনার অনুমতি ছাড়াই ঢুকে পড়ছি, কারণ আমার আশঙ্কা আপনার অনুমতি পাব না।

ও কী বলছেন আপনি! আমতা আমতা করে গুজরাট সার্কলের ডিরেক্টর বললেন, মন্ত্রী ও ডিরেক্টর জেনারেলের কাছ থেকে আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আদেশ পেয়েছি।

কাজ করুন তাঁদের আদেশ অনুযায়ী। গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন। দুর্জয় যেখানে আছে সেখান থেকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে আমাকে, জায়গাটি কোথায় নারায়ণভাই বুঝতে পেরেছেন।

যেখানেই থাকুক খুবই দুর্গম জায়গা, আপনি সেখানে পৌঁছতে পারবেন বলে মনে হয় না।

নিশ্চয়ই পারব। দুর্জয় যদি সেখানে পৌঁছে থাকে, আমিও সেখানে পৌঁছতে পারব। মিস্টার রায় ও নারায়ণভাই আছেন আমার সঙ্গে, নির্ভয়ে যাব।

খাঁড়িগুলোতে যাবার পথ নেই কোনো।

পথ নেই তো দুর্জয় গেল কি করে?

কোথাও যাবার জন্য তো জিয়োলজিস্টের পথের দরকার হয় না, পথ ছাড়াই সে চলতে অভ্যস্ত।

আমিও চলব সেভাবে। মিস্টার রায় তো জিয়োলজিস্ট, চলার অভ্যাস আশা করি তাঁর আছে। নারায়ণভাই, তুমি পারবে তো?

অবশ্যই পারব। নারায়ণ দেশাই জবাব দিলেন, মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে পথ তৈরি করে রক ক্লাইম্বিং করার ট্রেনিং নিয়েছি, কাজেই আমার কোনো অসুবিধে হবে না। শুনুন ডিরেক্টর সাহেব, যেখানে দুর্জয়কে যশোধরা বেন দেখেছেন, সে জায়গাটি আমি ম্যাপে মার্ক করে নিয়েছি। তার কাছাকাছি যতদূর পর্যন্ত জিপে যাওয়া সম্ভব ততদূর পর্যন্ত যাতে নির্বিঘ্নে যেতে পারি তার ব্যবস্থা করে দিন।

কালকের মধ্যেই করে দিচ্ছি ব্যবস্থা। গুজরাট সার্কলের ডিরেক্টর বললেন, একটা কথা মিস্টার দেশাই, মিসেস প্যাটেলের মতো আপনিও কি দুর্জয়কে দেখতে পেয়েছিলেন?

না। নারায়ণ দেশাই জবাব দিলেন, যশোধরা বেন মনে করে দেখার মতো আমার চোখ নেই বলেই দেখতে পাইনি।

আপনার ম্যাপটা বের করুন, কতদূর পর্যন্ত জিপে করে যেতে পারবেন তা ড্রাইভার লাকিরাম ও ওখানকার একজন মুক্তোর কারবারীর সাহায্যে আপনার ম্যাপেই চিহ্নিত করে দিচ্ছি।

ছবি : রঞ্জন দত্ত

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

চিঠিপত্র

(মতামতের দায়িত্ব সম্পাদকের নয়)

পুরস্কৃত সেরা চিঠি

অধিক উষ্ণতা

সংবাদপত্রে খবরটা পড়ে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খবরটা ছিল, সুন্দরবনে গ্যাস ও তেল উত্তোলনের জন্য খনন মার্চ-এর শেষ থেকে শুরু হবে বলে জানিয়েছেন ONGC-র সুবীর রাহা। হয়তো কাজ শুরুও হয়ে গেছে।

সুন্দরবনে জনবসতিহীন দ্বীপে তাঁবুর মধ্যে বাবা, মা, দাদা, আমি সকলে মিলে রাত্রিবাস করেছি। ভোরে বঙ্গোপসাগরে সূর্যোদয় দেখেছি, সেই সঙ্গে অর্জন করেছি কলসদ্বীপে বেড়ানোর মনোরম অভিজ্ঞতা। কলসদ্বীপের মিষ্টিজলের পুকুরটি বন্যজন্তু এমনকি মানুষের কাছে চারপাশের নোনাজলের মাঝে যেন সরবতের ভাণ্ড। পুকুরপাড়ে দেখলাম, এঁটেল মাটিতে চারটি বড় বড় থাবার টাটকা ছাপ। সামনের পা দুটো দেবে সে জল খেয়ে গেছে খানিক আগে।

যে কোনো একটি দেশের এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি থাকা দরকার। আমাদের দেশে বনভূমি ১৬ শতাংশ। তাও কমে যাবে সুন্দরবনে ONGC যদি তেল-টেল পায় তাহলে। অথচ সুন্দরবনের মতো সব বন-জঙ্গলকে গোটা পৃথিবীর অক্সিজেনের জোগানদার বলে ভাবা হয়। এই মহান অরণ্যকে ধ্বংস করার পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর।

একেই তো ক্লোরো-ফ্লুরো-কার্বন ব্যবহারের জন্যে বায়ুমণ্ডলের রক্ষাবর্ম ওজোন স্তরকে ধ্বংস করেছি আমরা। তার নিট ফল নানাধরনের রোগের বাড়বাড়ন্ত। বহুজাতিক বাগিচা-মালিকরা আমাজনের রেইন-ফরেস্টকে ধ্বংস করেছে। এরপর যদি সুন্দরবন ধ্বংস হয় তাহলে বনভূমির পরিমাণ দশ শতাংশের নীচে চলে যাবে।

এদিকে লক্ষ লক্ষ যানবাহনের স্রোতকে অর্গলমুক্ত করতে পথ-পাশে সবুজ চন্দ্রাতপ বীথিকাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছে এই শহর কলকাতাতে। যে গাছের সারিগুলো এতদিন দূষণ টেনে নিয়ে অধিক উষ্ণতা অপনয়ন করে নীলকণ্ঠ হয়ে আমাদের বাঁচিয়ে চলেছিল তার বিনাশ সর্বনাশ ডেকে আনছে আমাদের জীবনে। মানছি কলকাতার মতো A-1 শহরে যেখানে যানবাহন চলাচলের জন্যে ২০ শতাংশ পথ দরকার সেখানে এই শহরে আছে মাত্র ৬ শতাংশ। ফলে প্রথম কোপটি গিয়ে পড়ছে নবীন ও প্রাচীন বৃক্ষরাজির ওপর যারা এতকাল ধরে আমাদের সরবরাহ করে চলেছে প্রাণবায়ু নির্মল অক্সিজেন। তার নিট ফল দূষণ বৃদ্ধি এবং প্রথম ধাক্কাটি এসে পড়ছে শিশুদের ওপর। অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলেছে হাঁপানি। বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে। তাই আমাদের এখনই সাবধান হওয়ার দরকার।

লক্ষ্মীশ্রী লাই

(৯২৭, যশোর রোড, লেকটাউন, কলকাতা-৭০০ ০৮৯)

হাসির ফুলঝুরি

আমরা এখন এমন একটা অবক্ষয়ের যুগে বাস করছি যে সময়টা শিশু-কিশোরদের মুখের নির্মল হাসি একটু একটু করে কেড়ে নিচ্ছে। তারা প্রাণখুলে হাসতেই ভুলে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে শুকতারা নিঃসন্দেহে একটা সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই আমার প্রস্তাব শুকতারায় 'হাসির ফুলঝুরি' নাম দিয়ে সাহিত্যধর্মী একটা হাস্যরসাত্মক বিষয় সংযোজিত হোক।

তারাপদ বটব্যাল

(অমরকানন, বাঁকুড়া)

এয়ার ক্র্যাশ

বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'এয়ার ক্র্যাশ' ধারাবাহিকটি অসাধারণ। প্রতিটি সংখ্যায় কিছু না কিছু নতুনত্ব থাকে। এ ছাড়া ফাল্গুন সংখ্যায় শ্যামাপদ কর্মকারের 'ভুতুড়ে' উপন্যাস, পুরস্কৃত গল্প 'জিয়ন কাঠি' আকর্ষণীয়। বিজ্ঞানের খবর বিভাগটি আরও একটু বড় করলে ভালো হয়।

অতীন গুহঠাকুরতা

(রবীন্দ্র সরণী, নবব্যারাকপুর, কল-৩১)

ভালো লেগেছে

ফাল্গুন সংখ্যায় পুরস্কৃত গল্প বিভাগে চন্দ্রিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জিয়ন কাঠি' ও রাখহরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নতুন মা' গল্প দুটি খুব ভালো লেগেছে। এ ছাড়া অশোক সীর 'অজানা আতঙ্ক' ও ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের 'সাচ্চা বাচ্চা' ছড়াটি ভালো লেগেছে। হাঁদা-ভোঁদা ও বাঁটুল দি গ্রেটের জুড়ি মেলা ভার।

অর্ণব শীট

(কেঠারডাঙা, বাঁকুড়া-৭২২ ১০১)

একটি অনুরোধ

শুকতারা যদি বাংলা অথবা ইংরেজি মাসের কোনো নির্দিষ্ট দিনে প্রকাশিত হয় তাহলে খুব ভালো হয়। তাহলে আমাদের বারবার স্টলে গিয়ে খোঁজ নিতে হয় না।

অভিজিৎ দাস

(বিধান শিশু সরণী পুলিশ হাউসিং কমপ্লেক্স, ব্লক-এ ২/৩০৩, কল-৫৪)

রূপকথা সংখ্যা

চৈত্র মাসের রূপকথা সংখ্যাটি অনবদ্য। দূর্বা বাগচীর 'সূর্যমণি ও স্বর্ণকেশী রাজকন্যা', শুভ্র মজুমদারের 'বোষ্টম বাঘ-সিংহ', মনোজ সেনের 'সীতা' গল্পগুলি অসাধারণ। তারাপদ রায়ের 'টলস্টয়ের রূপকথা' অতিরিক্ত প্রাপ্তি। বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'এয়ার ক্র্যাশ' ভালো লাগছে। বাঁটুল দি গ্রেট, হাঁদাভোঁদা, বিচ্ছুর জাদুশক্তি নজর কাড়ার মতো।

দেবব্রত বাহাদুর

(কাটোয়া ছোটলাইনপাড়া, রেল কলোনি নং ১২ কে/১, কাটোয়া, বর্ধমান)

কুইজে বিবেকানন্দ

'কুইজে বিবেকানন্দ' পড়ে স্বামীজীর জীবনের নানা দিকের ঘটনার কথা জানতে পারলাম। খুবই ভালো লাগল। তার সঙ্গে উপরি পাওনা স্বামীজীর ধ্যানগম্ভীর ছবিটি। আমার অনুরোধ, এইভাবে একজন করে মনীষীকে নিয়ে কুইজ করা হোক।

দেবাশিস ভট্টাচার্য

(রাজারহাট, গোপালপুর, তেঁতুলতলা, উত্তর ২৪ পরগনা)

সেরা চিঠি

সেরা চিঠি প্রতিযোগিতায় শুকতারার পাঠক-পাঠিকারা যে কোনো বিষয়ের ওপর (রাজনীতি বাদ দিয়ে) চিঠি লিখতে পারে। সেরা চিঠিটি শুকতারায় ছাপা হবে এবং তার জন্যে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আনুমানিক একশো শব্দের মধ্যে চিঠি লিখতে হবে। যত খুশি চিঠি পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি চিঠির সঙ্গে নীচের কুপনটি থাকা চাই। কুপন ছাড়া কোনো চিঠি গ্রাহ্য হবে না। সেরা চিঠি মনোনয়নের ব্যাপারে শুকতারার সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। চিঠি পাঠাতে হবে সম্পাদক শুকতারার নামে। খাম বা ইনল্যান্ডের ওপর 'সেরা চিঠি' কথাটি লিখে দিতে হবে।

আমি শুকতারার 'সেরা চিঠি' প্রতিযোগিতায় আমার মনোনীত বিষয় নিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি। চিঠির মতামত সম্পূর্ণ আমার।

স্বাক্ষর (পুরো নাম) ....

সম্পূর্ণ ঠিকানা ....

অদৃশ্য ব্যাপার-স্যাপার

মানবেন্দ্র পাল

একদিন আধদিন নয়, প্রতিদিন। প্রতিদিন ঠিক একই সময়— এ যেন মৌ-এর একটা ভয়ংকর নেশা হয়ে উঠেছে। ঐ ঘরটা ওকে টানবেই।

অথচ ঘরটার কোনো বিশেষ আকর্ষণ নেই। না সাজানো-গোছানো, না যায় দেখা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। বরঞ্চ গোটা বাড়ির মধ্যে এই ঘরটাই সবচেয়ে পুরনো। সে আমলের ভারী ভারী কাঠের কড়ি-বরগা। একটা কড়ি তো ভেঙে ঝুলছে। একটু ভূমিকম্প হলেই হুড়মুড়িয়ে পড়বে। দেওয়ালের এখানে-ওখানে পলস্তারা খসে পড়ে নানা রকমের জন্তু-জানোয়ারের, কোথাও বা মানুষের মুখের আকৃতি ধারণ করেছে। একটা বই-এর থাক ছিল। সেখানে উই-এর লম্বা লাইন রেললাইনের মতো এঁকেবেঁকে দেওয়াল বেয়ে উঠে কড়িতে গিয়ে ঠেকেছে। বলা যায় আসল বাড়ি থেকে প্রায় সম্পর্কশূন্য একটা পরিত্যক্ত ঘর। সম্পর্কশূন্য অথচ একই পাঁচিলের মধ্যে। বসতবাড়ি আর এই পরিত্যক্ত ঘরের মধ্যে পড়ে আছে শুধু একটা উঠোন। উঠোনে মস্ত একটা কাঁঠাল গাছ আর কিছু বুনো ফুলের ঝোপ।

বাড়িতে লোক সর্বসাকুল্যে জনা পাঁচ-ছয়। কিন্তু দেশ থেকে আত্মীয়-কুটুমের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। মৌ হৈ-হট্টগোল পছন্দ করে না। কলেজে পড়ছে। তাই পড়াশোনা করার জন্যে ঐ পরিত্যক্ত ঘরটাই বেছে নিয়েছে। একটাই সুবিধে হুটহাট করে কেউ এসে পড়ে না।

দিনের বেলা ঐ ঘরে পুরনো একটা চৌকিতে বসে পড়াশোনা করে—ঠিক আছে। কিন্তু রাত্তিরবেলাতে—ঐ ঘরে একা—ওর দিদিরা বলে—রাত্তিরে ও ঘরে পড়ার দরকার কি? বাড়িতে ঘরের অভাব আছে?

বৌদি বলে—সত্যি ভাই মৌ, তোমার এটা খুব বাড়াবাড়ি। সন্ধের পর ঐ কাঁঠাল গাছের তলা দিয়ে যেতেই আমার গা ছমছম করে তো তেপান্তরের প্রান্তে

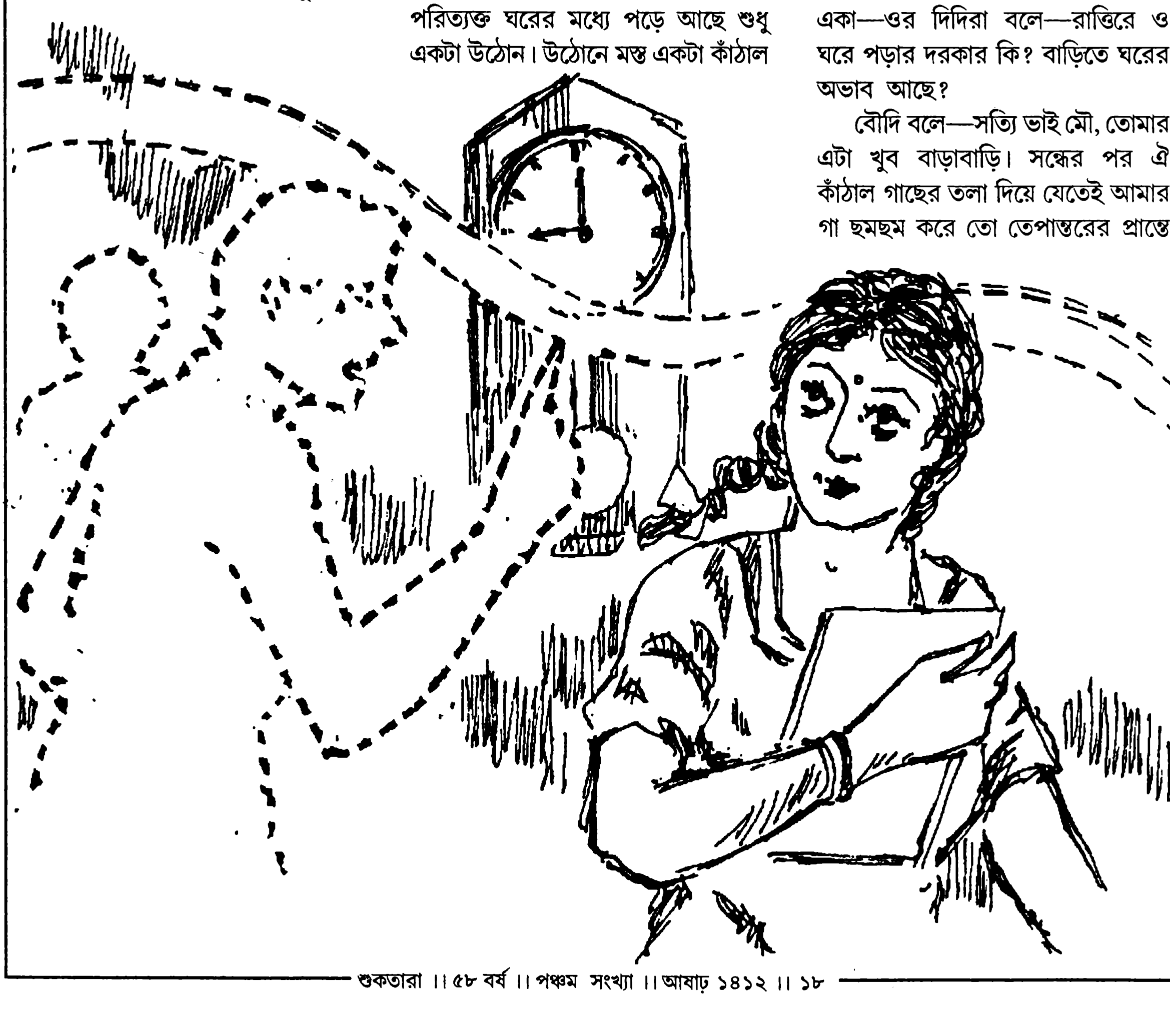

ঐ পোড়ো ঘর। আর শুধু ঐ ঘরটাই বা বলি কেন, এ বাড়িতে বৌ হয়ে এসে পর্যন্ত তো টের পেয়েছি—একদিন আধদিন নয়—

—ও সব কথা এই সন্ধেবেলা থাক না বৌদি। বলে উঠল মৌ-এর মেজদি।

মৌ-এর কাছে এসব কোনো কিছুই নতুন কথা নয়। সবই জানে সে। তবু সন্ধের পর থেকেই ঐ দিকের ঘরটা ওকে টানে। ও না গিয়ে পারে না। ভয়-ডর বলে কিছু নেই। আছে শুধু কৌতূহল। কী যেন ঘটে ঘরটার মধ্যে....অদৃশ্য ব্যাপার-স্যাপার।.....

সন্ধের পর মৌ তালা খুলে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে যায়। কিন্তু আশ্চর্য দরজাটা সহজে খোলে না। কিসে যেন আটকে যায়। অনেক সময়ে বর্ষাকালে কাঠ বেড়ে গিয়ে আটকে যায় ঠিক। কিন্তু এ তো শুধু বর্ষাকালের ব্যাপার নয়—শীত-গ্রীষ্ম সব সময়ে। মনে হয় ঘরের ভেতর কেউ আছে যে চায় না ঘরের মধ্যে বাইরের কেউ ঢুকুক। তাই যেন দরজায় পিঠ সেঁটে আগলে আছে।

মৌ এসবই জানে। জানে দু'হাত দিয়ে দরজা ঠেলতে হবে। তবেই খুলবে। আর—

আর দরজা খুলতেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ... ও চৌকাঠে দাঁড়িয়েই আগে বাঁ হাত বাড়িয়ে সুইচটা কোনোরকমে অন করে দেবে। ব্যস্! আলো জ্বলতেই সব ক্লিয়ার।

একটা জিনিস মৌ ঠিক বুঝতে পারে না। সন্ধের পর দরজা খুলতে এত ঠেলাঠেলি কিন্তু দিনের বেলা তো এমন হয় না। তখন তালা খুলে একটু ঠেলতেই দরজা খুলে যায়। জানলাগুলো তখনও বন্ধই থাকে কিন্তু ঐরকম উৎকট ভ্যাপসা গন্ধ পাওয়া যায় না। তার বদলে পাওয়া যায় তামাকের গন্ধ। গন্ধটা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কেন এমন হয়? তামাকের গন্ধই বা কেন? তাও একদিন নয়। প্রতিদিন শুধু সকালে।

এসব কথা বৌদি বা দিদিদের বলে না। বললে হয় তারা হেসে উড়িয়ে দেবে; না হয় আরও বেশি করে ভয় পাবে। কী দরকার? তা ছাড়া মৌ বুঝে নিয়েছে এসব তার একান্ত নিজস্ব গোপন ব্যাপার। এই যেমন—

এই যেমন রোজকার মতো আজও এই মুহূর্তে ঘটতে চলেছে—

সন্ধেবেলা ঘরে ঢুকে ঘণ্টা দু-এক বেশ মন দিয়ে পড়া যায়। কোনো ব্যাঘাত হয় না। একদিন আলো জ্বেলে ঘরে ঢুকেই অন্যমনস্ক হয়ে পুব দিকের রঙ-চটা ছোটো ছোটো জানলাগুলো খুলে দিয়েছিল। সেদিন সে পড়তে পড়তে রীতিমতো ভয় পেয়েছিল। ঠিক কিসের যে ভয় তাও নিজেও জানে না। পুব দিকে এই ঘরের গায়ে গায়ে এমন কোনো বাড়ি নেই যে আলো জ্বলতে দেখা যাবে। আছে একটুকরো পোড়ো জমি আর একটা মজা পুকুর। জমিটাতে ঘেঁটুবন আর কয়েকটা ছাতিম গাছ। ওদিকে তাকালে গা-টা কেমন ছমছম করে। পুকুরের ওপাশে বাঁশবনের অন্ধকারে কালকাসুন্দে গাছের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকির চোখ-পিটপিটানি। সেও যেন কেমন অস্বস্তিকর। মনে হয় ওরা যেন ভয় দেখাতে চাইছে। সবচেয়ে ভয় করে ঐ পোড়ো জমিটাকে। যার নাম 'পোড়া মাঠ'। জন্ম থেকে মৌ দেখে আসছে জমিটা অমনি পড়ে আছে। এখন জমির চাহিদা খুব। গ্রামের বড়ো বড়ো চাষীরা যাদের হাতে পয়সা আছে তারা শহরে চলে আসতে মরিয়া। খালি জমির সন্ধান পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু এই শহরের মধ্যে জমিটার নাম কেউ করে না। ভারি আশ্চর্য তো!

মৌ ওর ঠাকমার মুখে শুনেছে আজ এই যে শহর—ঠাকমা যখন নতুন বৌ হয়ে এ বাড়িতে আসেন তখন এমনটি ছিল না। চারিদিকে বন-জঙ্গল। দিনের বেলাতেই শেয়াল ঘুরে বেড়াতো ইতিউতি। কখনো ছিল ডাকাতের ভয়। গভীর রাতে মশাল জ্বালিয়ে রে-রে করে ডাকাতরা আক্রমণ করত গেরস্তবাড়ি। মেরেধরে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে মানুষ খুন করে লুঠপাট করে পালাত।

এই পাড়াতেই কোথায় এক সময়ে নাকি ছিল প্রবল প্রতাপ এক জমিদারবাড়ি অনেকখানি জায়গা জুড়ে। একদিন ডাকাত পড়ল সেই বাড়িতে। তারা যখন লুঠ করতে পারল না তখন জ্বালিয়ে দিল অনেকের ঘরবাড়ি। তারপর বছরের পর বছর কাটল। আগুনে পোড়া বাড়িগুলো একদিন ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

সেই জায়গাটাই কি আজ 'পোড়া মাঠ'?

মৌ-এর তা জানবার কথা নয়। সে শুধু নানা কথা শুনেছে ঠাকমার মুখে। তাদের আজকের এই বাড়ি—যে বাড়িতে বাস করছে তা এমন দোতলা কোঠা বাড়ি ছিল না। তখন সে বাড়িতে মৌদেরই কোন পূর্বপুরুষ থাকত, মৌ-এর ঠাকমাও তা বলতে পারেন না।

মৌ অন্যমনস্কভাবে ঐ একদিনই রাত্তিরে ঐ ঘরের জানলাগুলো খুলে ফেলেছিল। তার মতো মেয়েও সেদিন ভয় পেয়েছিল। কিসের ভয় তাও সে জানে না। শুধু এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস, 'পোড়া মাঠে' অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা ছাতিম গাছটা আর পুকুরের পাড়ে কালকাসুন্দে গাছের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকির মেলা। ব্যস্! মৌ তখনই জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল।

অথচ দিনের বেলা যখন জানলাগুলো খুলে পড়তে বসে তখন 'পোড়া মাঠ'-এর দিকে তাকিয়ে থেকেও ভয় করে না।

আজ রাত্রে পড়তে পড়তে সেদিনের কথা মনে করে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ নজর পড়ল দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে। পৌনে নটা!

তাহলে তো আর দেরি নেই! মৌ সতর্ক হল।

আচ্ছা, এই দেওয়াল-ঘড়িটা কত দিনের পুরনো? আজকাল গির্জের আকারের এই রকম বড়ো ঘড়ি দেখা যায় না। এই ঘরে টেবিল নেই, চেয়ার নেই, একটা পুরনো চৌকি ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। তা হলে অত বড়ো ঘড়িটা কেন?

টক্-টক্-টক্....ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। নটার দিকে। আর মাত্র সাত-আট মিনিট। একেবারে পাক্কা সময় নটা। টং টং করে ঘড়িতে নটা বাজবে আর শুরু হবে—

মৌ খুব ভালো করেই জানে নটা বাজলেই কী হবে। তাই সে নটা বাজবার

Suk–June-3

আগেই ঘর ছেড়ে পালাবে। পালাতে বাধ্য হবে।

নটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট। মৌ তাড়াতাড়ি বইখাতা গুছিয়ে নিল। তড়বড় করে উঠে পড়ল চৌকি থেকে। অসাবধানে পেনটা পড়ে গেল হাত থেকে। চৌকির তলা থেকে কুড়োতে সময় লাগল দু' মিনিট। তার পরই পড়িমরি করে চলে গেল দরজার দিকে। সুইচ অফ করতে হবে। দরজার—

ইস্! তালাটা রয়ে গেছে চৌকির ওপর। তাড়াতাড়ি আনতে গিয়ে হোঁচট খেল। কোনোরকমে তালাটা নিয়ে এসে সুইচ অফ করে দরজা বন্ধ করার মুহূর্তে ঘড়িতে টং টং করে বাজল নটা। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতরে শুনল অনেকগুলো হাল্কা পায়ের অস্পষ্ট শব্দ। কারা যেন এল। বইখাতা বুকে আঁকড়ে ধরে মৌ এক দৌড়ে উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল।

রান্নাঘর থেকে মা জিগ্যেস করল—পড়ার ঘরে তালা দিয়েছিস তো?

—হ্যাঁ। বলেই মৌ বইগুলো টেবিলে গুছিয়ে রাখতে লাগল।

ওপর থেকে মেজদি হাঁক দিল—পড়া হল?

নীচ থেকেই মৌ উত্তর দিল—হ্যাঁ।

—তবে একটু চা কর না বোন।

মেজদির এই এক বদ অভ্যাস। যখন-তখন চা-এর দরকার হয়।

বৌদি রুটি বেলতে বেলতে রান্নাঘর থেকেই চেঁচিয়ে বলল—আমি করে দিচ্ছি ঠাকুরঝি।

এই মুহূর্তে মৌ-এর কেমন আচ্ছন্ন ভাব। চা করতে হল না। ভালোই হল। সে তখন ভাবছে কী আশ্চর্য ব্যাপার! এ বাড়িতে কেমন সুন্দর জীবিত মানুষের জগৎ। আর উঠোন পারে ঐ ঘরটায় যেন মৃতের জগৎ।

মৃতের জগৎ—এটা তার কল্পনা নয়। বা হঠাৎ চোখে-পড়া কোনো বিশেষ ঘটনা নয়। এ ঘটনা রোজকার। বাঁধা সময় ধরে। আজ কত দিন ধরে ও এটা দেখে আসছে। দেখতে দেখতে রোজ ঐ সময়ে ঐ ঘরে থাকাটা নেশা হয়ে গেছে। প্রথম যেদিন এ ঘটনাটা দেখেছিল সেদিন রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। দিদিদের কাছে বলেছিল। তারা শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। বৌদি বলেছিল—সন্ধের পর একা একা ও ঘরে নাইবা গেলে ছোটো ঠাকুরঝি। পুরনো বাড়ি, পাশেই পোড়া মাঠ। তারপর ঐ ঘরে নাকি তিন পুরুষ আগে কালীপুজো হত। নিশিপুজো। একবার নাকি বলি বেধে যায়। সবাই হায় হায় করে উঠেছিল। আর সেই বছরই ছোটো খুড়শ্বশুর মায়ের ওপর অভিমান করে গলায় দড়ি দেয়। আহা তরতাজা ছেলেটা। তার অপরাধ কী ছিল? না, বউ-এর কথা শুনে চলত। মা কিছু বললেও বউকে না জানিয়ে করত না। এই নিয়েই মায়ে-পোয়ে অশান্তি। সত্যি-মিথ্যে জানি না ভাই, এখানে এসে অব্দি শুনে এসেছি। তারপর দিদিশাশুড়ির মুখে শুনেছি—

মৌ হেসে বলেছিল—চাটুজ্জেমশাই-এর কথা তো?

—হ্যাঁ। তুমি হাসছ বটে কিন্তু আমার সারা গা—এই দ্যাখো কিরকম কাঁটা দিচ্ছে।

বৌদি বলতে লাগল—কে এক কুটুম বাড়ির বৌ এসেছিল। এ বাড়ির তখন যিনি গিন্নি ছিলেন তিনি তাকে একা শুতে দিলেন না। দোতলার ঘরে নিজের বিছানায় নিজের পাশে শোয়ালেন।

তারপর—

মাঝরাতে নীচে কোন ঘরে যেন খটাস করে শব্দ। এত জোর শব্দ যে বৌটির ঘুম ভেঙে গেল। বুড়ি গিন্নিমা বললেন—ও কিচ্ছু না। চাটুজ্জ্যেমশাই মাছ ধরতে বেরোলেন। তুমি ঘুমোও।

কে এই চাটুজ্জেমশাই আজ পর্যন্ত পরিবারের কেউ জানে না। তবু এখনও পর্যন্ত মাঝে মাঝে দোতলায় শুয়ে দুপুর রাতে দরজার খিল খোলার শব্দ অনেকেই শুনেছে। আমিও শুনেছি।

মৌ বলল—রাত দুপুরে চাটুজ্জে-মশাই বেরোতে চান বেরোন। তাই বলে খিল খুলবেন এমন শব্দ করে যে লোকের ঘুম ভেঙে যাবে! এ বড়ো অন্যায় বৌদি!

বৌদি বলল—এটা বুঝছ না কেন তিনি হচ্ছেন বাড়ির কর্তা। নিঃশব্দে কাজ করা কর্তাদের ধাতে নেই। সব সময়ে জানান দেন—তিনি 'কর্তা'। যখন খুশি যা খুশি করবেন দাপটের সঙ্গে।

মৌ হাসি টিপে বলেছে—তা হলে কি ধরে নিতে হবে কবেকার কোন এক চাটুজ্জেমশাই আজও মনে করেন তিনিই এ বাড়ির কর্তা?

বৌদি গম্ভীর মুখে বললে—তা আমি জানি নে ভাই। তবে বলি, সন্ধের পর ও ঘরে নাই বা ঢুকলে?

মৌ হেসেই বলল—চাটুজ্জেমশাই না হয় এ বাড়ির কর্তা। এ বাড়িতেই অধিষ্ঠান করেন। তাঁর সঙ্গে আমার পড়ার ঘরের কী সম্পর্ক?

বৌদি একটু বিরক্ত হয়ে বলল—অতশত জানি নে। তবে উনি যদি বসতবাড়ির কর্তা হয়ে আজও থাকেন তাহলে তোমার পড়ার ঘরও ওঁর এক্তিয়ারের মধ্যে।

মৌ বিদ্রূপের সুরে বলল—পড়ার ঘর তো যারা পড়ে তাদের জন্যে। চাটুজ্জেমশাই কি তখন ঐ ঘরে বসে চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথি পড়তেন?

বৌদি চট্‌জলদি উত্তর দিল—আজ না হয় তুমি ওটাকে পড়ার ঘর করেছ। তার আগে কি ছিল কে জানে। হয় তো চাটুজ্জেমশাই-এর বৈঠকখানা ছিল।

বৈঠকখানা!

কথাটা মৌ-এর মনের মধ্যে গিয়ে গাঁথল। ঐ ঘরে প্রথম দিনের কথাটা মনে পড়ল।

....ঘরটা অনেক দিন ধরে বন্ধই ছিল। কোনো কাজে লাগত না। কলেজে পড়ার সময়ে মৌ আবিষ্কার করল সে বড়ো হয়েছে। পড়াশোনার চাপ বেড়েছে। এখন মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। তার জন্যে চাই নিরিবিলি পরিবেশ। তখনই ঠিক করে ফেলল এই ঘরটাকেই সে পড়ার ঘর করে নেবে। সকলের হাঁকডাকের বাইরে থেকে একমনে পড়তে পারবে।

আগের দিন লোক দিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করে চৌকির ওপর মাদুর পেতে রেখেছিল মৌ। সকাল বেলায় মুখ ধুয়ে, চা খেয়ে বই-খাতা নিয়ে তালা খুলে ঢুকল ঘরে। ঢুকতেই মিষ্টি মিষ্টি অথচ কড়া একটা গন্ধ.....কিসের গন্ধ মৌ ঠিক বুঝতে পারল না....অথচ যেন চেনা গন্ধ।

মৌ পুব দিকের জানলা দুটো খুলে দিল। সে আমলের ছোটো ছোটো জানলা। জানলার গায়েই পোড়া মাঠ। একেবারে নেমে গেছে পুকুরের ধারে। চোরকাঁটা, বনতুলসী আর ঝোপঝাপে ভর্তি মাঠটা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ছাতিম গাছটা। ওদিকে দেখা যাচ্ছে তেলাকুচো লতার টুকটুকে পাকা ফল। পুকুরের ওদিকে আকন্দর ঝোপ। বাতাসে আকন্দ ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। সবচেয়ে ভালো লাগল এই সকালবেলাতেই সজনে গাছের ওপর দিয়ে সোনা রোদ গড়িয়ে পড়েছে মাঠের বুকে। এত সুন্দর যে মাঠ তাকে বলে কিনা পোড়া মাঠ!

সে দিনই সন্ধেবেলা এই ঘরটাই যেন কেমন কেমন। তালা খুলে দু' হাতে দরজার কপাট ঠেলে চৌকাঠে পা রাখতেই কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ। ঘরের মধ্যে জমাট বাঁধা অন্ধকারটাও যেন কেমন অচেনা।

ও তাড়াতাড়ি বাঁ হাত বাড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে সুইচবোর্ডটা খুঁজে পেল। সুইচ অন করতেই ঘরটা আলোয় ভরে গেল। উঃ, কত কাল পর এ ঘরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলল!

মৌ জানলা খুলতে গিয়েও খুলল না। পাশেই পোড়া মাঠ—ঝোপজঙ্গল। সাপ ঢুকতে পারে। ঠিক করল আগে জানলায় তারের জাল লাগিয়ে নেবে। তারপর—

মৌ খুব উৎসাহ করে পড়তে শুরু করল। তখন সন্ধে সাতটা। নিরিবিলিতে সকালের মতোই বেশ মন দিয়ে পড়ছিল। কিন্তু এই সন্ধেতে নিরিবিলিটা যেন বড্ড বেশি মনে হল। এত চুপচাপ ভালো লাগল না। কেবলই মনে হতে লাগল ঐ যেন কিসের শব্দ হল....খুব আস্তে। না, ঘরের মধ্যে শব্দ নয়। ঘরের বাইরে। ও তৎক্ষণাৎ দরজাটার দিকে তাকাল। খোলা দরজাটা যেন হাঁ করে গিলতে আসছে!

আচ্ছা, দরজাটা কি খুলে রেখেই পড়তে বসেছিল?

হতে পারে।

মরুক গে। ভয় পাবার কি আছে? নিজেদের বাড়ি তো।

একটাই ভয়—বাইরে থেকে পাঁচিল

টপকে যদি কেউ—

হ্যাঁ, যদি কেউ চুপি চুপি এসে তার মুখটা চেপে ধরে! চিৎকারও করতে পারবে না। চিৎকার করলেও বাড়ির কেউ শুনতে পাবে না।

না-না, এরকম কাল্পনিক ভয় পেলে পড়া হবে কি করে? তার চেয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভালো।

মৌ উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

এইবার নিশ্চিন্ত। এইবার পড়ায় মন বসবে।

মন দিয়েই পড়েছিল মৌ—তা ঘণ্টাখানেক। কিন্তু তারপরই ক্রমশ এই নির্জনতা কেমন ভারী হয়ে উঠতে লাগল। মনে হল যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

মন থেকে এইরকম অস্বস্তি দূর করে মৌ জোর করে পড়া মুখস্থ করার চেষ্টা করল। কিন্তু বারে বারেই মনে হতে লাগল এই ঘরে সে যেন আর একা নেই।

তখনই উঠে দাঁড়াল কী ঘটছে দেখার জন্যে।

কিন্তু চোখে কিছুই পড়ল না। শুধু হঠাৎ মাথার ওপর থেকে ঝুরঝুর করে বালি ঝরে পড়ল।

মৌ-এর মনে হল কেউ যেন তাকে ঘর থেকে চলে যেতে ইঙ্গিত করছে।

মৌ নিজেকে বোঝাল এ তার মনের ভুল। পুরনো বাড়ি, বালি খসে পড়তে পারেই।

তবু গায়ের ভেতর কেমন করতে লাগল। ইচ্ছে করছিল চলে যেতে। কিন্তু যুক্তিহীন ভয়ের কাছে সে হার মানতে চায় না।

দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ল। নটা বাজতে দশ মিনিট। হঠাৎ পুব দিকের একটা জানলা খুলে গেল। ঝড় নেই, জোর বাতাস নেই, তাহলে কি করে খুলল?

তারপরেই ঘরের ভেতর অনেকগুলো খালি পায়ের হালকা শব্দ। কারা যেন ঢুকেছে ঘরে। যারা ঢুকেছে তারা চৌকিটার সামনে এসে দাঁড়াল। যেন মৌকে দেখে অবাক। এ আবার এই সময়ে এখানে মরতে এল কেন?

মৌ যেন স্পষ্ট বুঝতে পারল সে এখানে থাকে এরা তা চায় না। মৌ-এর গায়ে নিঃশ্বাসের গরম হাওয়া।... "যাও—যাও—"

ফিসফিসে গলার সতর্কবাণী।

টং টং করে ঘড়িতে নটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজাটা আপনি খুলে গেল।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল মৌ। ওদের জন্যে এখন ঘর ছেড়ে দিতে হবে।

বই-খাতা তুলে নিয়ে মৌ আলো নিবিয়ে তালা বন্ধ করার সময়ে ওদের মতো ফিস ফিস করে বলল—আপনারা কে তা জানি না। তবে আমি আসবই—রোজ আসব। এ আমার পড়ার ঘর। এ আমি মনের মতো করে গুছিয়ে নিয়েছি।

মৌ তার প্রতিজ্ঞা রেখেছে। এখনও রোজ দু' বেলা এ ঘরে বসে পড়ে। তবে রাত্রিবেলা নটা বাজবার আগেই ওদের জন্যে ঘর ছেড়ে দিতে হয়।

ওরা কারা মৌ জানে না। জানতে চায়ও না। কী দরকার?

ছবি : সন্দীপ দেয়াসী

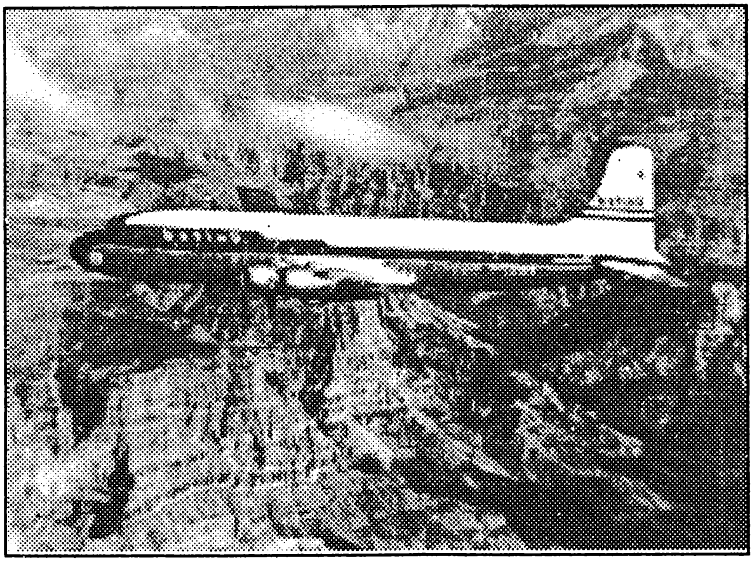

এয়ার ক্র্যাশ

বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পাইলটের ক্লান্তি এবং অবসাদ

নামী কোম্পানির পাইলট না হতে পারার দুঃখটা কুরে কুরে খেত ক্যাপটেন রিডকে। এয়ারবাস কিংবা জাম্বোর ককপিটের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। কিন্তু তাঁকে চালাতে হত ফোর কিংবা সিক্স সিটার বীচ এয়ারক্র্যাফট। সব এয়ারক্র্যাফটগুলি ছিল বড়লোকদের ব্যক্তিগত প্লেন। সপ্তাহ শেষে ছুটি কাটাতে ওঁরা বেড়িয়ে বেড়াতেন নানা জায়গায়। তারপর বাড়ি ফিরতেন রবিবারের রাতে। এইসব ধনাঢ্যদের প্লেন চালাতেই ডাক পড়ত ঠিকে পাইলট রিডের।

রোজ রোজ ডাক তো আসত না। ফলে পেট চালাতে অন্য ধান্দাও করতে হত তাঁকে। অর্থের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করে রিড যখন বাড়ি ফিরছেন গভীর রাতে সেই সময়ই হয়তো কন্ট্রাকটরের লোক ফোন করে বলত, কাল ভোর চারটেতে এয়ারপোর্টে চলে যেও। কাজ আছে তোমার। এই ডাকের প্রতীক্ষাতেই সময় কাটত রিডের। আসলে আকাশে উঠলেই তাঁর মনটা ভালো হয়ে যায়। নানা কষ্ট আর চির-দুঃখে ভরা পৃথিবী তখন তাঁর পায়ের তলায়।

সেই সন্ধ্যাতে হঠাৎ ডাক পেতেই রিড ভেসে পড়েছিলেন আকাশে। এক বিত্তবান মানুষ সপরিবারে ছুটি কাটিয়ে ফিরছিলেন তাঁর নিজের দেশে। মাত্রই দেড় ঘণ্টার উড়ান তবু প্লেনটিকে কুড়ি হাজার ফিট ওপরে তুলতেই রিডের মনে হচ্ছিল তাঁর গন্তব্য বুঝি পৃথিবীর অপর প্রান্ত। যেন সেখানে কোনও ভাবেই পৌঁছানো যাবে না। বহু ঘণ্টা প্লেন চালানোর অভিজ্ঞতা তাঁর। কিন্তু এমন অস্বস্তি তাঁর আগে কখনও হয়নি। প্রচণ্ড ঘুমে তাঁর শরীর যেন শিথিল হয়ে আসছিল। বারেবারে মাথা ঝুঁকে পড়ছিল কন্ট্রোল স্টিকের ওপর। সেই সময় প্লেনগুলির কন্ট্রোল স্টিক থাকত পাইলটের সামনে। অবিকল গাড়ির স্টিয়ারিংয়ের মতো। রিড আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন জেগে থাকতে। কিন্তু ঘুমের কাছে তাঁকে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ডুবে গেলেন অতল ঘুমে। তাঁর সারা শরীরে নেমে এল প্রশান্তি। হা-ক্লান্ত রিডকে যেন বড় মায়াভরে আপন কোলে স্থান দিলেন ঘুমের দেবী। ধীরে, অতি ধীরে ওঁর মাথাটি নেমে এল কন্ট্রোল স্টিকের ওপর। চাপ পড়তেই দণ্ডটি পিছলে সরে আসছিল নীচের দিকে। ফলে প্রতি মুহূর্তে প্লেনটি বিপজ্জনকভাবে নীচের দিকে নামছিল। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠছিলেন ভেতরের কজন যাত্রী। কিন্তু না, রিডের সেই বহু আরামের ঘুম আর ভাঙেনি। কয়েক মুহূর্ত পরেই প্লেনটি আছড়ে পড়ে কঠিন জমিতে। তারপর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। চার যাত্রীর সঙ্গে রিডও পাড়ি দেন চিরঘুমের দেশে।

শুধু রিড নন। বহু বছর আগে আমেরিকার বেশ কয়েকজন পাইলট মারা যান ঠিক একই ভাবে। সরকারি তদন্ত হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল দুর্ঘটনায় পড়া প্রতিটি প্লেনই ছিল বেসরকারি এবং পাইলটরাও ছিলেন প্রায় সকলেই ভাড়াটে বা ঠিকে। সারাদিন নানা কাজে ঘোরাঘুরির পর ওঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়তেন খুব। যার পরিণতি শেষ পর্যন্ত হত মৃত্যু। মার্কিন সরকার আইন করলেন, কন্ট্রোল স্টিকের নীচে গোঁজ ঢোকাতে হবে। যাতে ঘুমন্ত বৈমানিকের মাথার ভারে কন্ট্রোল স্টিক নীচের দিকে পিছলে না যায়। সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল পাইলটদেরও। বলা হয়েছিল, অসতর্কতার প্রমাণ পাওয়া গেলেই বাতিল হবে লাইসেন্স।

মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে যাওয়া যাক বহু বছর আগেকার একটি দিনে।

ঘুম এসে এমনই একজনের স্বপ্নপূরণে বারেবারেই বাধা দিচ্ছিল। সেই মানুষটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন সারা বিশ্ববাসী। তাঁর সফলতা এলে গড়বে নতুন ইতিহাস। নইলে মানুষটি চলে যাবেন মহাকালের গহ্বরে তথা বিস্মৃতির আড়ালে। তিনি লিখে গেছেন তাঁর সেই মরণ ঘুমে পাওয়া মুহূর্তগুলির কথা ঃ

'আমার মন তখন একবার বলছে হ্যাঁ, পরক্ষণেই বলছে না। প্রচণ্ড ঘুমে যখন ভারী হয়ে আসছে দু'চোখের পাতা তখন একটি চোখ বন্ধ করে তাকে বিশ্রাম দিয়েছি, খুলে রেখেছি অপরটি প্রবল মনের জোরে। কিন্তু বুঝছিলাম প্রতি মুহূর্তে ঘুম এসে আমাকে গো-হারান হারিয়ে দিচ্ছে। আমার সারা শরীর সোচ্চার হয়ে সেই সময় বলছিল, মানুষের জীবনে ঘুমের মতো প্রয়োজনীয় আর কিচ্ছু নেই। তাই শান্তিতে ঘুমিয়ে নাও।'

না, তিনি কিন্তু সেদিন ঘুমোননি। ক্লান্তিতে আর অবসাদে শরীর দুমড়ে গেলেও শুধু মনের জোরে তিনি ঘুমকে পরাস্ত করেন। পরিবর্তে ইতিহাসের পাতায় তিনি চিরস্মরণীয় মানুষ হিসেবে ঠাঁই পেয়ে যান। যে নাম আজও ফেরে লোকের মুখে মুখে।

দিনটি ছিল ১৯২৭ সালের ২০ মে। চার্লস এ লিন্ডবার্গ নামে এই আমেরিকানটি তাঁর 'দ্য স্পিরিট অফ সেইন্ট লুইস' নামে ছোট্ট প্লেনটি নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন নিউইয়র্ক শহর থেকে ফ্রান্সের প্যারি শহরে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্লেনে আটলান্টিক মহাসাগর পেরনো। এরোপ্লেনের তখন কতই বা বয়স। মানুষের চব্বিশ বছরের উড়ান ইতিহাসে এমন দুঃসাহস তখনও পর্যন্ত কেউ দেখাননি। লিন্ডবার্গের কথা শুনে অনেকেই বলেছিলেন, দুঃসাহস দেখাতে গিয়ে ছোকরা নিজের প্রাণটাই জলাঞ্জলি দিয়ে আসবে মহাসাগরে।

লিন্ডবার্গ মহাসাগর পেরিয়েছিলেন একটি সাধারণ কম্পাস, একটি এয়ার স্পিড ইন্ডিকেটর এবং অবশ্যই দুর্জয়

রেলের লেভেল ক্রশিং হয় কিন্তু এরোপ্লেনের?

সাহস সম্বল করে। সাড়ে তেত্রিশ ঘণ্টার সেই উড়ান সত্যিই যখন প্যারি শহরে শেষ হল, সেখানে তখন জমায়েত হয়েছে এক লক্ষ মানুষ। সারা পৃথিবীর মানুষ রেডিওর মাধ্যমে খবর রাখছিলেন চার্লসের। অগাধ জলরাশি যে মানুষের ওড়ার পথে কোনও বাধাই নয় তা সর্বসমক্ষে প্রমাণ করলেন চার্লস। কিন্তু নামার পরই তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন, 'প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল ঘুম এসে আমার সলিল সমাধির ব্যবস্থা করল বলে।'

লিন্ডবার্গ কিংবা রিডের প্লেনে তো অটো পাইলটের মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ ছিল না। থাকলে অবশ্য প্লেন চালাতে চালাতেই আরামের ঘুম ঘুমিয়ে নিতে পারতেন ওঁরা। কিন্তু তার জন্যও আছে নানা প্রস্তুতি। তবু আজও বিজ্ঞানের এই বিশাল সাফল্যের যুগেও স্রেফ পাইলটের অবসাদ আর ক্লান্তির জন্য ভেঙে পড়ে প্লেন। মারা যান শয়ে শয়ে মানুষ।

সব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যেমন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের VC-10 এয়ারক্র্যাফটের পাইলট। ভদ্রলোককে সাহসী বলতে হবে। নীচে নামার পর তিনি সবিস্তারে ঘটনাটি বলেও ছিলেন সকলকে। প্লেনটি লন্ডন থেকে যাচ্ছিল মধ্যপ্রাচ্যের কোনও দেশে। পাইলট তখনও নিজেই চালাচ্ছেন। অটো পাইলটের সুইচ বন্ধ রয়েছে। এমতাবস্থায় হঠাৎই তিনি আবিষ্কার করলেন তিনি গভীর ঘুমে ডুবে গিয়েছিলেন। নিজেকে ঝটকা মেরে তুলে প্রথমেই তিনি লক্ষ করেছিলেন তাঁর সহকারী পাইলটকে। আরে কী আশ্চর্য! তিনিও যে তাঁর চেয়ারে ঘুমিয়ে একেবারে কাদা। ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন সেই প্লেনটিতে। পাইলট দেখেছিলেন কম্বল মুড়ি দিয়ে একেবারে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছেন ভদ্রলোক। পাইলটটি আন্দাজ করেছিলেন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় প্লেনটি ঠিক পনের মিনিট উড়েছিল। ঘুম ভাঙতেই পাইলট প্রথমে ঝটকা মেরে তাঁর আসনে খাড়া হয়ে বসেন। তারপর নজরদারি ও অটো পাইলটের সুইচ অন করার পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান।

বহু পাইলটের মুখে সেই দুর্ভাগা পাইলটটির গল্প খুব শোনা যায়। গল্পটি সেই 'হারাধনের দশটি ছেলে' ছড়ার মতোই জানেন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত পাইলট। সেই পাইলট তাঁর অটো পাইলটের হাতে দায়িত্ব দিয়ে তোফা ঘুম দিচ্ছিলেন। যখন ঘুম

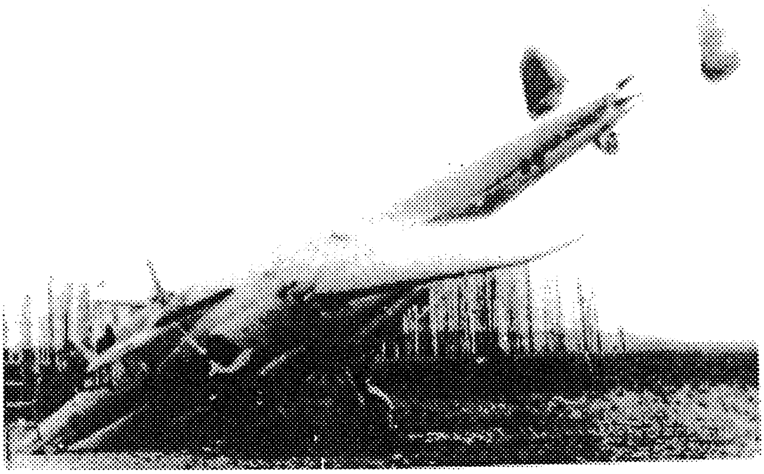

পাইলটের ভুল না অবসাদ?

ভাঙল তখন তিনি দেখলেন নিকটতম এয়ারপোর্ট দু'ঘণ্টার দূরত্বে কিন্তু তেল মজুত রয়েছে স্রেফ এক ঘণ্টার।

ঘটনাটা আদৌ ঘটেছিল কিনা তার সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। তবে বাস্তবে এমন ঘটনা যে কখনও ঘটবে না তা কে বলতে পারে? কত এরোপ্লেনই তো রসহ্যময় কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। পাইলটের ক্লান্তি কিংবা অবসাদই যে সেই ধ্বংস এবং জীবনহানির কারণ সে কথা ঘোর সত্য হলেই বা প্রকাশ করছে কে?

১৯৯৯ সালের জুন মাসে দক্ষিণ-পূর্ব আমেরিকার লিট্‌ল রক নামে একটি জায়গায় আমেরিকান এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ১৪২০ প্লেনটি নেমে আসছিল। ম্যাকডোনেল ডগলাস MD-82 মডেলের প্লেনটি ল্যান্ডিংও করেছিল চমৎকার। কিন্তু সেটি রানওয়ে ছাড়িয়েও এগিয়ে গিয়েছিল একটি এবড়ো-খেবড়ো জায়গায়, যেখানে প্লেনের চাকা পৌঁছনোর কথাই নয়। বজ্রপাত সহ ভয়ানক বৃষ্টি চলছিল সেইসময়। রানওয়ের ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার পর প্লেনটি দাঁড়িয়ে যায়। ১৪৫ জনের মধ্যে মারা গিয়েছিল ১১ জন যার মধ্যে ছিলেন প্লেনটির ক্যাপটেন স্বয়ং। আহত হয়েছিলেন বহু মানুষ। তদন্তে প্রকাশ পেয়েছিল পাইলট তাঁর অতিরিক্ত সময়ের ডিউটির জন্য ভালো করে ঘুমতেই পারেননি।

প্রয়োজনীয় ঘুমের অবকাশ না পেলে কী কাণ্ড হতে পারে তা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছিলেন কোরিয়ান এয়ারলাইনসের ক্যাপটেন পার্ক-য়ং-সুল। তিনি ছিলেন ঐ কোম্পানির একজন সিনিয়ার এবং অতি অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত পাইলট। ১৯৯৭ সালের ৬ আগস্ট তিনি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন কোরিয়ান এয়ারলাইনসের একটি বোয়িং ৭৪৭ অর্থাৎ জাম্বো জেট। গন্তব্যস্থল ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর ছবির মতো একটি দ্বীপ গুয়াম। কিন্তু গন্তব্যে আর নামা হয়নি তাঁর। গোটা প্লেনটি নিয়ে তিনি আছড়ে পড়েন এক সুউচ্চ পর্বতমালার ওপর।

প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে বলা হয় ঐ সময় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল তাই ক্যাপটেন ঠাওর করতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তী অনেক তথ্যপ্রমাণ হাতে আসায় দেখা গিয়েছিল, ক্যাপটেন পার্ক প্লেনটিকে নামানোর সময় একটার পর একটা ভুল করে গেছেন। তাঁর মনঃসংযোগের ক্ষমতা প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছিল। এবং প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তিনি আছড়ে পড়েন পাহাড়ের উপর সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে। মৃত্যু হয়েছিল ২২৭ জন মানুষের।

পার্কের মৃত্যুর পর তাঁর ডিউটি লিস্টটা বার করা হয়েছিল, যা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন অনুসন্ধানকারী কর্মীরা। কোম্পানি প্রায় যন্ত্রের মতোই ব্যবহার করেছিল ক্যাপটেনকে। কেমন ছিল সেই শিডিউল যা দেখে তাঁর সহকর্মীরা অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরে উঠেছিলেন কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস পাননি?

পার্ক সেদিন প্রথমে কোরিয়ার সিওল থেকে প্লেন নিয়ে যান অস্ট্রেলিয়া। সেখান থেকে আবার ফেরত আসেন সিওলে। সিওল থেকে ফের একটি প্লেন নিয়ে তিনি চলে যান হংকং এবং আবার ফেরত আসেন তাঁর দেশে। ডিউটি শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কোম্পানির লোক না থাকাতে ফের পার্ককে বলা হয়েছিল জাম্বো নিয়ে গুয়াম যেতে। তদন্তকারী দল দেখেছিলেন মোট আঠেরো ঘণ্টা উড়ানের মধ্যে পার্ক বিশ্রাম পেয়েছিলেন মাত্রই তিন ঘণ্টা। যথাযথ বিশ্রাম এবং ঘুম হলে পার্কের মতো একজন বিচক্ষণ কর্মীকে হারাত না কোম্পানি।

রিড নামধারী আরেক পাইলটও মারা গিয়েছিলেন একটি নতুন প্লেন চালাতে গিয়ে। ওনার পুরো নাম ছিল জো-রিড। জো-ও ছিলেন একজন ভাড়াটে পাইলট। মিঃ ডাবরফ নামে এক ধনকুবের এবং তাঁর সাত বছরের মেয়ে জেসিকাকে নিয়ে জো আকাশে ভেসে পড়েছিলেন আনকোরা নতুন একটি সেসনা বীচ ক্র্যাফট নিয়ে। এয়ারপোর্টে নামবার সময় অটো পাইলট অফ না করেই তিনি প্লেনটিকে নামবার চেষ্টা করতেই সেটি আচম্বিতে নীচে নেমে আসে এবং মুখ থুবড়ে পড়ে আগুন জ্বলে যায়। তদন্তে প্রমাণিত হয়েছিল প্লেন চালানোর সময় জো ছিলেন হা-ক্লান্ত অবস্থায়। ফলে সময় মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও তিনি হারিয়েছিলেন।

পাইলটের অবসাদ কিংবা ক্লান্তিজনিত কারণে এয়ার ক্র্যাশের তালিকা দীর্ঘতর করে লাভ নেই। বরং

এসব নিয়ে যাঁদের সবচেয়ে বেশি মাথাব্যথা, যাওয়া যাক নাসার সেইসব বৈজ্ঞানিকদের দফতরে। নাসার এই বিভাগটির নাম ফ্লাইট হিউম্যান ফ্যাক্টরস ব্রাঞ্চ। আকাশ-উড়ান সংক্রান্ত ও মহাকাশযাত্রার যাবতীয় তথ্য ওঁদের কম্পিউটারে ভরা থাকে। যে কোনো দুর্ঘটনার তদন্ত ওঁরা করে নেন এইসব তথ্যের সাহায্যে। ওঁরা বলেছেন, দুর্ঘটনাকে প্রতিহত করার সমস্ত উপায় থাকলেও এখনও বহু পাইলট মৃত্যুর মুখোমুখি হন স্রেফ ক্লান্তি আর অবসাদের জন্য। ওঁরা পরিসংখ্যান প্রকাশ করে দেখিয়েছিলেন আমেরিকায় যত প্লেন ক্র্যাশ হয় তার শতকরা কুড়ি ভাগই ঘটেছে পাইলটদের ভুল-ভ্রান্তির জন্য এবং তার মূল কারণ ছিল শুধুই অবসাদ।

এই অবসাদকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন নাসার বৈজ্ঞানিকগণ। এ দুটি হল Acute Fatigue এবং Chronic Fatigue. Acute Fatigue হল সেই সব অবসাদ যা হঠাৎই হয় এবং তা মোটেই পুরনো দীর্ঘস্থায়ী অবসাদ নয়। এই অবসাদে দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রায় সকলেই ভুগে থাকি। এই ক্লান্তি আসে দিনের শেষে বহুক্ষণ কায়িক অথবা মানসিক পরিশ্রম করার পর। হঠাৎ আসা এই ক্লান্তির উপশম করাও সহজ। ভালোমতো বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাবার এবং দৈনিক ব্যায়াম। এই হঠাৎ হওয়া ক্লান্তিকে যদি ঠিক মতো উপশম করা না যায় তবে তা ক্রমশ রোজকার সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকেই Chronic Fatigue বলে সাবধান করে দিয়েছেন বৈজ্ঞানিকরা। যদি প্রতিদিন কেউ কম ঘুমোন তবে তাঁর কর্মক্ষমতার ওপর তার প্রভাব পড়বে। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে সুদীর্ঘ সময় ধরে বিশ্রাম নিতেই হবে এবং অবসাদের মূল কারণটি খুঁজে বার করে তাকে অপসারণ করতে হবে।

নাসা এও বলেছে যে দীর্ঘ অবসাদের কারণে মানুষের কী কী অসুবিধে দেখা দিতে পারে। এগুলি হল ঃ

খুব নিচু দিয়ে উড়তে গিয়ে শুকনো ডাঙায়।

১) সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধে হওয়া।

২) অনেকজনের সঙ্গে কাজ করতে নেতিবাচক মনোভাব।

৩) দ্বন্দ্ব বা গুরুতর সমস্যার সময় অন্য মানুষজনদের সঙ্গে মেলামেশা করতে না পারা।

৪) মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা প্রায় শূন্যে এসে নামে। কোনওরকম জরুরি তথ্য মাথায় রাখাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

চ্যালেঞ্জার স্পেস শাটল নামে যে মহাকাশযানটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তার কারণ হিসেবেও মহাকাশচারীদের নিদ্রাহীনতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ছন্দহীনতাকেই দায়ী করেছিলেন নাসার বিজ্ঞানীরা। নানা ধরনের ভুল কাজকর্মের ফলেই ধ্বংস হয়ে যায় মহাকাশযানটি।

অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করতে না পারার প্রমাণটি পাওয়া গিয়েছিল ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটি প্লেনের ভয়েস রেকর্ডার থেকে। ক্যাপটেনের তিরিক্ষি মেজাজ আর রুক্ষ স্বর শুনে বুঝতে অসুবিধে হয়নি তিনি ছিলেন মানসিক অবসাদগ্রস্ত। তিনি তাঁর সহকারীকে খুবই রুক্ষভাবে বলেছিলেন, 'Don't talk, do your job and I'll fly the plane.' ওঁর Duty List-এও পাওয়া গিয়েছিল অতিরিক্ত পরিশ্রমের প্রমাণ। অবসাদের জন্য মন দিয়ে কথা শুনতে

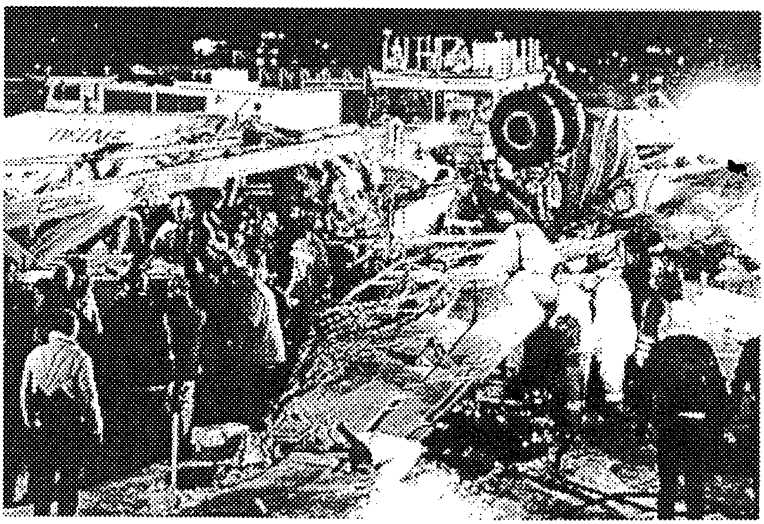
উদ্ধার কাজ চলছে।

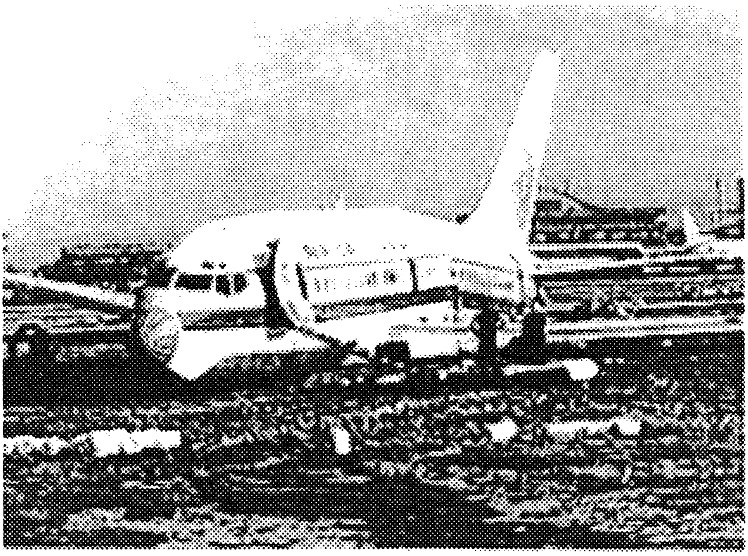

পাখা ভেঙে জলাভূমিতে।

পারেননি কো-পাইলট। ওঁদের প্লেন তখন প্রায় নীচে নেমে এসেছে। এমন সময় পাইলট লক্ষ করলেন তাঁর সহকারীর চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর মনে কিছু আনন্দ সঞ্চার করতেই বুঝি পাইলট বলেছিলেন, 'Cheer up' এ কথাটি কো-পাইলট শুনেছিলেন 'Gear up.' এবং কথামতো প্লেনের গিয়ার বদল করতেই ঝটতি অনেকগুলি জীবনের ওপর যবনিকা নেমে আসে।

রিড ঘুমোতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। অথচ তাঁর উত্তরসুরিদের নাসা বলছে, যদি বাঁচতে চাও ঘুমিয়ে পড়ো। উড়ন্ত এরোপ্লেনের ককপিটে বসেই ওঁদের হাত-পা ছড়িয়ে ঝিমিয়ে নিতে বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর শোওয়ার ঘরে চলে যেতে। যেখানে প্রাণভরে ঘুমোবার জন্য চমৎকার আরামদায়ক বিছানা পাতা রয়েছে।

ঘুম তাড়াবার জন্যও নাসা কিছু কিছু ফরমান জারি করেছে। যেমন সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পগাছা করা, এবং কেফিনযুক্ত পানীয় গ্রহণ। স্বাস্থ্যকর খাবারের ওপর জোরটাই সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে। দেওয়া আছে এমন কিছু খাবারের তালিকা যা খাওয়া মাত্র শক্তির সঞ্চার করবে। পাইলটদের নাসা বলেছে, মনে রেখো, খাবার এবং জলের মতোই ঘুমও তোমার জীবনে অপরিহার্য। ঘুমহীন কাজ মানেই রাডারের পরদা থেকে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা।

দূরপাল্লার প্লেনগুলিতে এখন পাইলট বা হোস্টেসদের জন্য ঘুমোবার ব্যবস্থা রাখাটা আবশ্যিক। কিন্তু স্বল্প পরিসর এয়ারক্র্যাফটে কোথায় হবে এত মানুষের শোওয়ার জায়গা? হোস্টেসরা ঘুমিয়ে পড়লে কেই-বা এত যাত্রীদের দেখাশোনা করবেন?

এসব উত্তর পেতে গেলে ঢুকতে হবে দূরপাল্লার কোনও ৭৪৭-৪০০ জাম্বো বা এ-৩৪০ এয়ারবাসের ভেতর। এই ধরনের প্লেনে সবশেষে তোলা হয় একটি করে ভ্রাম্যমাণ বিশ্রামকক্ষ বা 'মোবাইল ক্রু রেস্ট'। এই ঘরটিতে রয়েছে আটটি আরামদায়ক বাঙ্ক, অক্সিজেন মুখোশ, কমানো বাড়ানো যায় এমন আলো আর টেলিফোন। সম্পূর্ণ ঘরটি বলাই বাহুল্য নিখুঁতভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এয়ার হোস্টেস বা পার্সাররা এখানেই পালা করে ঘুমিয়ে নেন।

কিন্তু পাইলটরা কখন শুতে আসবেন এখানে? উড়ন্ত এরোপ্লেনের মধ্যে কোন সময়টি তাঁরা বাছবেন একটু ঝিমিয়ে নিতে আর কখনই বা যাবেন শোয়ার ঘরে? ওঁর অনুপস্থিতিতে কে-ই বা তাঁর অফিস সামলাবে?

আসলে পাইলটদের চরম ব্যস্ততার সময় টেক অফ থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছনো পর্যন্ত ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ এবং 'ফ্লাইট প্ল্যান মনিটরিং' নিয়েই তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয় বেশি। নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে প্লেনটিকে অটো পাইলটের জিম্মাতে দিলে একটু অবসর পাওয়া যায়। নাসা পাইলটদের এই সময়টিকে বেছে নিতে বলেছেন ঝিমিয়ে নিতে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অন্তর পাইলটদের শোয়ার ঘরে যাওয়াটা বাধ্যতামূলক। তখন তাঁর আসনে বসবেন একজন তৃতীয় পাইলট। দূরপাল্লার উড়ানে যাঁর উপস্থিতি আবশ্যিক। নাসার মতে ককপিটে যেন সবসময় দুজন তরতাজা এবং চনমনে পাইলট থাকেন। তা দিনের যেকোনও সময়তেই হোক না কেন। যাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তা এতে অবশ্যই বাড়ে। বাড়ে প্রতিটি বিমানকর্মীর জীবনের নিরাপত্তা। সেই সঙ্গে কোম্পানির সুনাম।

দূরপাল্লার এক পাইলটকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'উড়ন্ত শোয়ার ঘরে ঘুম বুঝি খুব আরামের?'

পাইলটটি উত্তরে জানিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, ঘুম মাত্রই আরামের। যদি অবশ্য ইচ্ছেঘুমের সৌভাগ্য থাকে। তাই ঐ ঘরে শুয়ে শুধুমাত্র শরীরের ঘড়িটিকে 'অ্যাডজাস্ট' করি আমরা। ভালো করে ঘুমিয়ে নেওয়ার চেষ্টাটা আমরা ডিউটি শুরুর আগেই করি। যাতে এতগুলি জীবনের দায়িত্ব কাঁধ পেতে নেওয়া যায়। আর ককপিটে বসে ঘুম? ওসব চিন্তাতেই আনি না কখনও। আইন যাই বলুক না কেন, এতগুলি প্রাণের জিম্মাদারি বড় সহজ কথা নয়।'

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

আজ তোমাদের এমন একজন মানুষের কথা বলব যার কথা শুনলে মনে হবে যেন গল্প শুনছি। সত্যিই তাই। সে চোখে দেখতে পায় না, ঠিকমতো বলতে পারে না কথা। হাত-পা থেকে আরম্ভ করে শরীরের কোনো অংশই স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। প্রথমে পোলিও কেড়ে নিয়েছে হাত-পায়ের জোর। পরে কুষ্ঠরোগের আক্রমণ তাকে আরও বিপাকে ফেলেছে। তবু মনের জোর হারায়নি শেওড়াফুলির স্বপন আচার্য। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে পাত্তা না দিয়ে শুধু মনের জোরে চালিয়ে গেছে পড়াশোনা। রিষড়া কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছে। গান-বাজনা সে বরাবরই ভালোবাসে। বাজাতে পারে তবলা, এসরাজ আর বেহালা। কিন্তু কুষ্ঠ হবার পর সে সব বন্ধ হয়ে যায়। দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিল সে। তারপরই তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন স্পোর্টস মেডিসিনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নির্মল ঘোষ। তাঁর চিকিৎসায় ও চেষ্টায় স্বপনের হাত ও কব্জির সাড় সামান্য ফিরে আসে। তখনই তিনি তার হাতে তুলে দেন এসরাজ। দিব্যি সুর ফুটে উঠল তার হাতের জাদুতে। সে বাজাতে লাগল রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর, অতুলপ্রসাদের গান। কিছুদিন আগে কলকাতায় চৌরঙ্গি রোডে রোটারি সদনের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান করে গেছে স্বপন। রবীন্দ্রসঙ্গীত আর অতুলপ্রসাদের গানের সুর বাজিয়ে সে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। স্বপন আচার্যর আদর্শ—হেলেন কেলার। তাই হুগলি জেলার শেওড়াফুলির চারাবাগান এলাকার স্বপন আজও লড়ে চলেছে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে।

এবার এস তোমাদের কয়েকজনের চিঠির উত্তর দিই।

অরূপ রায় (প্রযত্নে—অশোক রায়, সোদপুর বি টি রোড, পোঃ পানিহাটি, আর ডি বাগান, উঃ ২৪ পরগনা)

উত্তর ঃ এতদিনে তো রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ভালো রেজাল্ট হয়েছে। এবার তো ক্লাশ টেনে উঠলে। বন্ধু নেই কে বলল? শুকতারা আছে, শুকতারার বন্ধুরা আছে—তাই না! একদম মন খারাপ করবে না। কিছু করার না থাকলে গল্পের বই পড়ো, কেমন!

অনির্বাণ মুখার্জি [অর্ঘ্য] (প্রযত্নে—প্রদীপ কুমার মুখার্জি, পোঃ ও গ্রাম-লাভপুর, বাবুপাড়া, বীরভূম-৭৩১ ৩০৩)

উত্তর ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিশ্চয়ই ভালো দিয়েছ। তুমি শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্য সিরিজের বইগুলোর জন্যে টাকা পাঠাতে পার। ঠিকানা—দেব সাহিত্য কুটীর, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯।

সম্পৎ সেনগুপ্ত (ফ্ল্যাট-৬, ১০, ধনদেবী খান্না রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪)

উত্তর ঃ দাদুমণিকে তুমি বলবেই তো। তুমি মাইক্রোবায়োলজিতে অনার্স নিয়ে পড়ছ জেনে খুব খুশি হয়েছি। মন দিয়ে পড়ো। তোমায় যে অনেক বড় হতে হবে।

লিলি দাস (ভট্টাচার্য পাড়া, গুপ্তিপাড়া, হুগলি-৭১২ ৫১২)

উত্তর ঃ মণিপুরে নিরাপত্তা বিভাগে কর্মরত সৌগত মণ্ডল তোমার পেনফ্রেন্ড জেনে ভীষণ ভালো লাগছে। টিউশানি নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তুমি যে শুকতারা পড় তা জেনে আমরাও খুব খুশি হয়েছি। সৌগতও দেখ না অত দূরে বসে শুকতারা পড়ে, চিঠি লেখে।

সানি সরকার (গ্রাম-বিলচাতরা, পোঃ-মালিবাড়ি, মুর্শিদাবাদ-৭৪২ ৩০৪)

উত্তর ঃ কী, এবার খুশি তো! চিঠির উত্তর পেলে। তোমাদের পাতার জন্যে গল্প-কবিতা পাঠাতে চাইছ তো? নিশ্চয়ই পাঠাবে। চিঠির মধ্যে ভ্যাম্পায়ার না বাদুড় কী এঁকেছ?

অমিতাভ বসু (শীলবাগান, চন্দননগর)

উত্তর ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার সময় তো হয়ে এল। দেখ, তুমি নিশ্চয়ই ভালো ফল করবে। লেখা পাঠাবার কোনো নিয়ম নেই। তুমি পাঠিয়ে দাও। সম্পাদকমণ্ডলীর ভালো লাগলেই ছাপা হবে। শারদীয়া শুকতারায় নটরাজনের 'সৈনিক' গল্পটি তোমার ভালো লেগেছে জেনে আমরাও খুশি হয়েছি।

কৃষ্ণদাস বাগ (বরগোদা, গোদার, পূর্ব মেদিনীপুর)

উত্তর ঃ কল্পবিজ্ঞানের লেখা তো মাঝে মাঝে ছাপা হয়। কল্পবিজ্ঞানের ওপর একটি বিশেষ সংখ্যা নিশ্চয়ই পাবে।

সাঁসুসি মণ্ডল (পোঃ ও গ্রাম-কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা-নদীয়া)

উত্তর ঃ কারো ঠিকানা কাগজে ছাপার অনেক বাধা থাকে। তুমি এক কাজ করো, চেনা-জানা যাঁর কমপিউটার আছে তাঁকে বলো ওয়েব সাইট খুলে অমিত সানার যোগাযোগ কেন্দ্রটি জেনে নিতে।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও। জয়হিন্দ।

—তোমাদের দাদুমণি

Suk—June-4

তোমাদের পাতা

সুনামি

পৃথিবীর বুকে তখন আকুল উত্তেজনা
উথলে উঠল শত নিঃশ্বাস হয়ে ;
দীর্ণ হল ধরণীর বুক—
দীর্ঘ ফাটল সাগরের তলে!
নিমেষে আলোড়ন উঠল শান্ত সাগরে,
গভীর অনন্ত কালো স্রোত
ছুটল বিপুল বেগে—
এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ;
মাটির বুকের কাছে এসে
সেই গতিমান কমিয়ে নিল গতি!
উঠল বিপুল ঢেউ, সাগর যেন
ছুটে এল লোকালয়ে! উন্মত্ত রাগে!
ভাঙল সুখের বাসা,
লণ্ডভণ্ড হল উৎসবের আনন্দ,
ভাঙল কত ঘর, কত হৃদয়!
ভাসিয়ে নিল ঘরবাড়ি,
ভাসিয়ে নিল প্রিয়জনকে।
সুনামি হঠাৎ এমন করে এল
বোঝার আগে, জানার আগে!
ভেঙে দিল নিশ্চিন্ততা।
নটরাজের মত্ত নাচন
জানিয়ে দিয়ে গেল—
সৃষ্টি, স্থিতির শেষে
প্রলয় বুঝি সমাগত!
এবার শান্ত হও, মহেশ্বর!
হও ধ্যানস্থ—গভীর সাগরের মতো।।

তিয়াসা চট্টোপাধ্যায়
বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণি,
ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়,
কলকাতা

৬
প্রিয়াংকা ব্যানার্জী,
বয়স তেরো,সপ্তম শ্রেণি,
সিস্টার নিবেদিতা গার্লর্স স্কুল, কলকাতা

গ্রীষ্ম

গ্রীষ্ম মানেই জানলা খোলা
প্রখর রোদের তাপ
গ্রীষ্ম মানেই পরীক্ষা শেষ
বন্ধ বইয়ের ঝাঁপ।
গ্রীষ্ম মানেই দখিনা বাতাস
ক্লান্ত দুপুরবেলা
গ্রীষ্ম মানেই আমবাগানে
মৌমাছিদের মেলা।
গ্রীষ্ম মানেই জলের অভাব
রুক্ষ গাছপালা
গ্রীষ্ম মানেই শুষ্ক মাটি
শান্ত নদী-নালা।
গ্রীষ্ম এলেই শুরু হয়ে যায়
নববর্ষের পালা,
মোরা সবাই আহ্বান জানাই তোমায়
নিয়ে বরণডালা।

উষিতা দাশ রায়,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণি,
উত্তরপাড়া গার্লস হাই স্কুল,
হুগলি

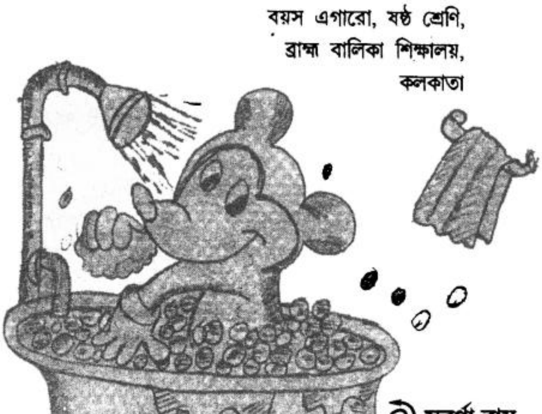

১ **সুবর্ণা রায়,**
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণি,
হরিসভা হিন্দু উচ্চ বিদ্যালয়,
কলকাতা

তোমাদের পাতা

ও মণিদীপা ঘোষ চৌধুরী,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণি,
সাগরদীঘি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,
মুর্শিদাবাদ

বর্ষা এল

আম এল সাথে নিয়ে জাম, লিচু, ফলসা,
পিছু পিছু জামরুল, জমে গেল জলসা।
আঠালো কাঁঠাল কোয়া কী যে মধু মিষ্টি
আঁটি ভেজে মুড়ি মেখে জমে ভারি ফিস্টি।
পাতিলেবু, কাগজির সরবতে মজে মন,
তরমুজ চায় নাকো? সে আবার কোন জন?
জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি মনে আসে ভরসা,
ধূমল মেঘের দলে এল বুঝি বরষা।
টিপ টিপ, ঝিম ঝিম, সুমধুর বাজনায়
আকাশ শিখরে আজ মোহময়ী সাজ নেয়।
ঝিঁঝি ডাকে একটানা, ব্যাঙেদের কনসার্ট
সন্ধ্যায় ভরে তোলে বনফুলে ঢাকা মাঠ।
পথঘাট জলে ভরা পুকুর যে থই থই,
মুচমুচে আলুভাজা, খিচুড়ি? তাই সই।

পলাশ সিনহা,
বয়স তেরো, সপ্তম শ্রেণি,
উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ,
হুগলি

মা

রোজ সন্ধ্যায় একটি তারা দেখি আকাশে
মায়ের কথা মনে পড়ে নয়ন ভিজে আসে।
শাসন মা করত ঠিকই, পিটুনিও দিত,
কাঁদলে আবার মুছিয়ে আঁখি কোলে তুলে নিত।
সিঁদুররাঙা ললাটে যেন প্রভাত সূর্য ওঠে
সোনা মায়ের মুখ দেখে দিনটি যেত কেটে।
আলতা টুক্‌টুক্ পায়ে মা হাঁটত যখন,
মনে হত মাই আমার সবচেয়ে সেরা রতন।
হঠাৎ আকাশে উঠল ঝড়
হারিয়ে গেল মা যে আমার।
মমতাময়ী চলে গেছে ঐ আকাশের কোলে,
রাগ করে কি গেল চলে? গেল না তো বলে!
তাইতো কাঁদি আজও আমি জানো 'শুকতারা'
স্নেহময়ী মা যে আমার গেছে হয়ে তারা।

চৈতালী গুহ,
বয়স সতেরো, দ্বাদশ শ্রেণি,
পাঁচপোতা ভাড়াডাঙা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়,
উত্তর ২৪ পরগনা

ও মল্লার ব্যানার্জী,
বয়স আট, তৃতীয় শ্রেণি,
হিন্দু স্কুল, কলকাতা

বর্ষার দিন

হাওয়া বয় ফুরফুর,
পাতা ঝরে ঝুর-ঝুর।
মেঘ ডাকে কড়-কড়,
বৃষ্টি পড়ে ঝর-ঝর।
ব্যাঙ ডাকে গ্যাঙর গ্যাঙ,
পা পিছলে চিৎপটাং।

সায়নী চট্টোপাধ্যায়,
বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণি,
দুর্গাদাসী চৌধুরানী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়,
বর্ধমান

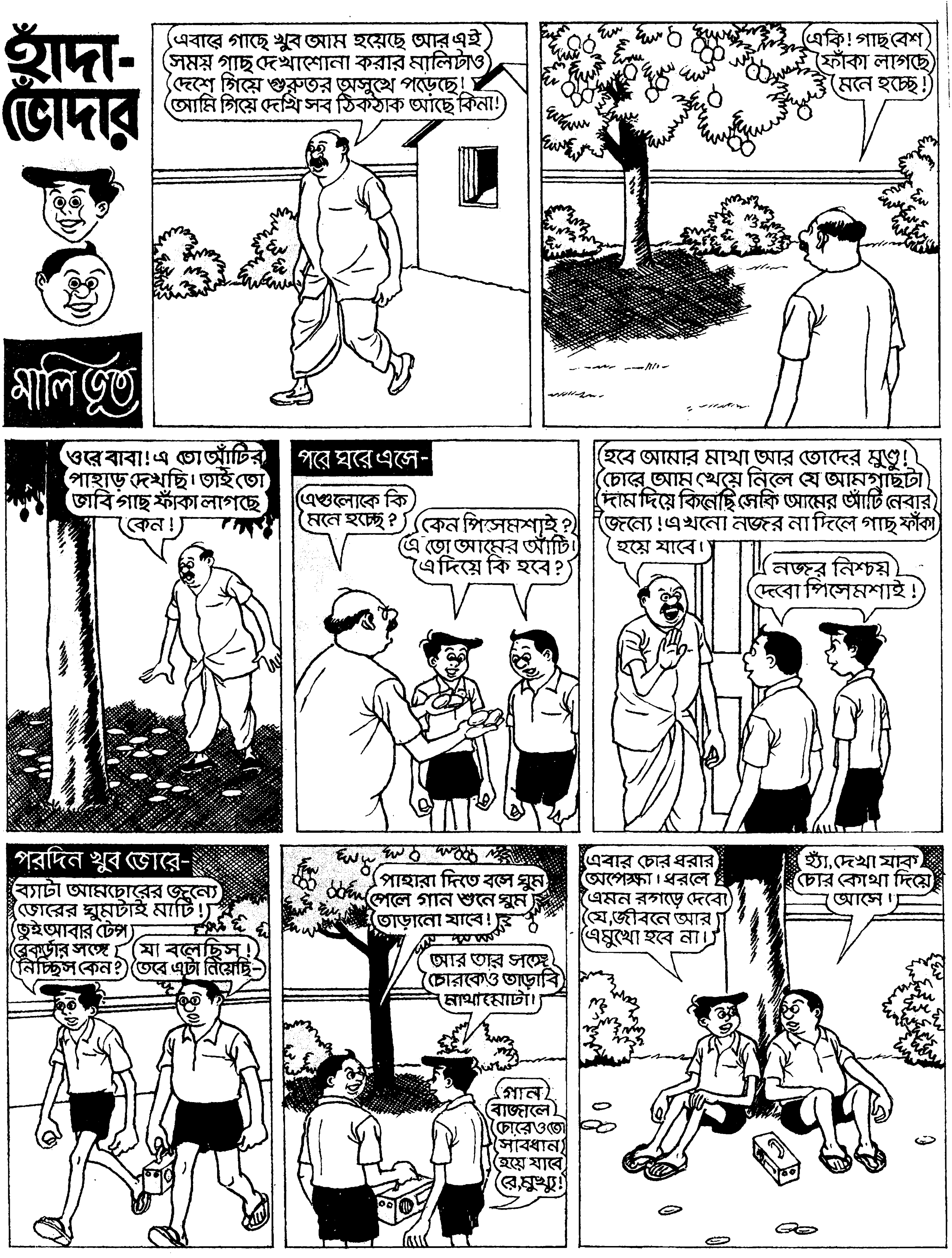
হাঁদা-ভোঁদার
মালি ভূত
এবারে গাছে খুব আম হয়েছে আর এই সময় গাছ দেখাশোনা করার মালিটাও দেশে গিয়ে গুরুতর অসুখে পড়েছে! আমি গিয়ে দেখি সব ঠিকঠাক আছে কিনা!
একি! গাছ বেশ ফাঁকা লাগছে মনে হচ্ছে!
ওরে বাবা! এ তো আঁটির পাহাড় দেখছি। তাই তো ভাবি গাছ ফাঁকা লাগছে কেন!
পরে ঘরে এসে-
এগুলোকে কি মনে হচ্ছে?
কেন পিসেমশাই? এ তো আমের আঁটি! এ দিয়ে কি হবে?
হবে আমার মাথা আর তোদের মুণ্ডু! চোরে আম খেয়ে নিলে যে আমগাছটা দাম দিয়ে কিনেছি সেকি আমের আঁটি নেবার জন্যে! এখনো নজর না দিলে গাছ ফাঁকা হয়ে যাবে।
নজর নিশ্চয় দেবো পিসেমশাই!
পরদিন খুব ভোরে-
ব্যাটা আমচোরের জন্যে ভোরের ঘুমটাই মাটি! তুই আবার টেপ রেকর্ডার সঙ্গে নিচ্ছিস কেন?
যা বলেছিস! তবে এটা নিয়েছি-
পাহারা দিতে বসে ঘুম পেলে গান শুনে ঘুম তাড়ানো যাবে!
আর তার সঙ্গে চোরকেও তাড়াবি মাথামোটা!
গান বাজালে চোরেও তো সাবধান হয়ে যাবে রে, মুখ্যু!
এবার চোর ধরার অপেক্ষা। ধরলে এমন রগড়ে দেবো যে, জীবনে আর এমুখো হবে না।
হ্যাঁ, দেখা যাক চোর কোথা দিয়ে আসে।

কিছু পরেই-
কে রে, মাথায় আঁটি ছুঁড়ছিস?
নির্ঘাত আমচোর এসে গেছে! কিন্তু এলো কোথা দিয়ে?
এটাই বোধহয় আমচোর, হাঁদা!
তাহলে তো এখুনি গিয়ে পাকড়াতে হয়।
ধর, হাঁদা, ব্যাটাকে জাপটে ধর- ইরক্! এ কে রে!
ওরে, ভোঁদা! আমরা এ কাকে ধরতে এসেছি? এ তো ভূ-উ-ত!
আঁমি আঁম খেঁকো ভূঁত। এঁ গাঁছের আঁম খুঁব মিঁষ্টি। খাঁবে নাঁকি?
ওরে, ভোঁদা রে, আমার মাথা ঘুরছে রে! আমি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবো রে! হিক!
আঁমচোর ধঁরতে এঁসে তোঁমার বঁন্ধু ভিঁরমি খেঁলো নাঁকি?
একটু পরে
আঁরে, তোঁমরা হাঁদা আঁর ভোঁদা নাঁ?
হ্যাঁ, কিন্তু তুমি আমাদের নাম জানলে কি করে?
চিঁনবো নাঁ কেঁন। আঁরে আঁমি যেঁ তোঁমাদের বাঁগানের মাঁলি ছিঁলুম। দেঁশে গিঁয়ে অঁসুখে মঁরে গিঁয়ে এঁই বাঁগানের মাঁয়া নাঁ কাঁটাতে পেঁরে ভূঁত হঁয়ে এঁখানে চঁলে এঁসেছি আঁর আঁম খাঁচ্ছি।
সেকি! তুমি আমাদের মালি ছিলে আর তোমাকে দেখে খালি খালি ভিরমি গেলুম!
গাছের আম বিক্রি করে পিসেমশাই টু পাইস আমদানির ব্যবস্থা করার পর গাছের আম কমে যাওয়ায় গাছের তলায় আঁটি দেখে চুরি করে কেউ খাচ্ছে বুঝতে পেরে চোর ধরতে এসে দেখি তুমি আম খাচ্ছো। কিন্তু তাতে পিসেমশাইয়ের টু পাইসের ক্ষতি হয়ে যাবে, মালি ভূত!
এঁই কঁথা! কোঁন চিঁন্তা নেঁই, এঁবারে আঁমি গাঁছ পাঁহারা দেঁবো। কেঁউ চুঁরির চেঁষ্টা কঁরতে এঁলে তাঁর ঘাঁড় মঁটকে দেঁবো।
দুটো আম পেঁড়ে দিচ্ছি, খেঁতে খেঁতে বাঁড়ি যাঁও।
ঘরে ফিরে-
কিরে, চোর ধরতে পেরেছিস?
ধরেছি, পিসেমশাই! আর সেই চোরকেই আবার আম পাহারায় রেখে এসেছি। এখন কারো সাধ্য হবে না তোমার আমে হাত দেওয়ার। কি বলিস রে, হাঁদা?
এক্কেবারে সঠিক!

পাতালের মাতুল

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

[শুকতারার বয়স ৫৮ বছর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে বাংলার যশস্বী সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেরই লেখা ছাপা হয়েছে শুকতারায়। 'ফিরে দেখা' বিভাগে আমরা শুকতারার পাতা থেকে এক এক করে তুলে আনছি বাংলা শিশু-সাহিত্যের কিছু মণি-মাণিক্য। শুকতারার ১৪০৮ সালের শারদীয়া সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে এই পর্ব। এবারের সংখ্যায় ছাপা হচ্ছে শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহার লেখা গল্প 'পাতালের মাতুল'। লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল শুকতারার সপ্তবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় অর্থাৎ চৈত্র ১৩৮০ বঙ্গাব্দে। সঃ শুকতারা।]

কথা শুনলে গায়ে জ্বালা ধরে গাঁয়ের লোকের।

যত নালিশই আসুক ডল্‌ফের নামে, মা তা হেসে উড়িয়ে দেন—"ও ছেলে আমার তেমন নয় গো! দুটো দিন যেতে দাও বাছারা, ওর বুদ্ধিটা একটু পাকুক, তখন দেখো, ও একটা নামকরা মানুষ হবে দেশের মধ্যে। একটু ক্ষ্যামা-ঘেন্না এই কয়টা দিন তোমরা না করলে, আর কে করবে বল!"

বিধবা অনাথা মেয়েমানুষটাকে কী আর বলা যায় মুখের উপর? বেগুন বেচা মুখ করে সবাই চলে যায় হেলিগার গিন্নীর সমুখ থেকে। গজগজ করে আড়ালে আড়ালে—"শাসন নেই, শিক্ষা নেই। বুদ্ধি যখন পাকবে, ও ছেলে হবে ডাকু। এই পনেরো-ষোল বছরেই যা নমুনা ছাড়ছে বাছাধন। কারও বাগানে একটা আপেল পাকবার জো নেই, ও গিয়ে রাতের আঁধারে তা পেড়ে এনেছে। কারও মোরগ উঠোনের বাইরে আসবার জো নেই, ও তাকে ভোগে লাগিয়েছে শিককাবাব করে। বুদ্ধি পাকলে?—হুঁঃ!"

অনাথা হেলিগার গিন্নীর মুখ চেয়ে গাঁয়ের লোক বাধ্য হয়েই দস্যি ছেলেটাকে ক্ষ্যামা-ঘেন্না করে। তবে সদাই তারা সচেষ্ট থাকে ওর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে। সদাই চোখ-কান মেলে রাখে, যাতে নিজেদের ছেলেগুলোও উচ্ছন্নে না যায় ওর সঙ্গে মিশে। উপায় কী? সাবধান থাকতেই হবে কয়টা বছর, যতদিন বুদ্ধি না পাকে ডল্‌ফের।

সবাই ডল্‌ফের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে, কেবল এক বুড়ো গ্রুট ছাড়া। গির্জার চাকরি করে গ্রুট। গাঁয়ে কেউ মরলে গ্রুটই তার কবর খোঁড়ে। কাজেই তার একটু আলাদা রকম খাতির আছেই গাঁয়ের ভিতর। সেই খাতিরটুকু সম্বল করে বুড়ো লেগে গেল, কী করে ছেলেটাকে কোন একটা কাজে ভিড়িয়ে দেওয়া যায়, সেই চেষ্টায়।

ডাক্তার নিপারসেন হচ্ছেন গাঁয়ের একমাত্র ডাক্তার। ওষুধপত্র তাঁর তত নেই, যত আছে মোটা মোটা ডাক্তারী কেতাব। যখনই কোন রোগী আসুক, দেখতে পাবে ডাক্তারটি বসে আছেন সেই সব কেতাবেরই কোন একখানায় তন্ময় হয়ে। রোগী দাঁড়িয়ে বা বসে নিজের ব্যারামের বৃত্তান্ত বলে গেল। ডাক্তারের চোখ কিন্তু বই ছেড়ে রোগীর দিকে একবারও তাকিয়ে দেখল না। বৃত্তান্তটা শেষ হলে একটা হাঁক শোনা গেল—ডাক্তার ডাকছেন তাঁর সহকারীকে, ওষুধ দেবার জন্য।

সহকারী একজন চিরদিনই রাখেন ডাক্তার নিপারসেন। একাধারে সে ছাত্র ও কম্পাউণ্ডার। গাঁয়েরই কোন গরিবের ছেলেকে তিনি বহাল করেন এ কাজে। উদয়াস্ত সে খাটে। বড়ি পাকায়, মলম বানায়, পাঁচমিশেলী ওষুধে জল ঢেলে ঢেলে লাল নীল সাদা ওষুধ তৈরি করে হরেক রকম। বিনিময়ে খেতে ও শুতে পায় ডাক্তারের বাড়িতে, আর পায় ভবিষ্যতের জন্য দরাজ প্রতিশ্রুতি—"তোকে আমি পুরোদস্তুর ডাক্তার বানিয়ে দেব। আমি মরলে আমারই জায়গা তুই দখল করতে পারবি এ গাঁয়ে"—ইত্যাদি।

ছাত্র কম্পাউণ্ডার এ যাবৎ অনেক এসেছে নিপারসেনের কাছে, কেউ এক বছর কেউ দুই বছরের বেশী টেকেনি। একঘেয়েমির জন্যই হোক অথবা পেট ভরে খেতে না পাওয়ার জন্যই হোক, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পাকাপোক্ত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সবাই পালিয়েছে একে একে। গ্রুট

শুনতে পেল, আবার কম্পাউণ্ডারের সিংহাসন খালি হয়েছে নিপারসেনের ডাক্তারখানায়। সে গিয়ে ধরে পড়ল ডাক্তারকে—"ডল্ফ হেলিগারকেই নিতে হবে মশাই! ওর বাবা আমার দোস্ত ছিল। আমার খাতিরে ছেলেটার একটা হিল্লে করে দিন আপনি।"

ডাক্তারের কাজ মানুষকে কবরে পাঠানো, গ্রুটের কাজ মানুষের জন্য কবর খোঁড়া। কাজেই পরোক্ষভাবে দুজনকে সহকর্মী না বলা যাবে কেন? অন্ততঃ গ্রুট ত নিশ্চয়ই ডাক্তারকে মনে করে সহকর্মী, তা নইলে কিসের জোরে সে খাতির দাবি করে তাঁর কাছে?

সে যাই হোক, খানিকটা গাঁই-গুঁই করে শেষ পর্যন্ত ডল্ফকেই চাকরি দিলেন ডাক্তার। পাড়াপড়শী মন খুলে আশীর্বাদ করল ডাক্তার আর গ্রুট দুজনকেই।

নিপারসেন ডাক্তারের চাকরি যখন নিয়েছে ডল্ফ, দিনের বেলাটা অন্ততঃ গাঁয়ের বাড়িগুলো রেহাই পাবে ওর দৌরাত্ম্য থেকে।

আশীর্বাদ করলেন হেলিগার গিন্নীও। তাঁর এতকালের আশা বুঝি সফল হবার পথ ধরেছে এইবার। নিপারসেন ত বলেইছেন ডল্ফকে ডাক্তার করে দেবেন। তা ডাক্তারের চেয়ে মান্যগণ্য লোক আর কে থাকতে পারে পাড়াগাঁ জায়গায়? তিনি পড়শীদের ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন—"দেখলে ত? আমি বলিনি যে ও একটা নাম-করা মানুষ হবে দেশের মধ্যে?"

দিন কাটে। ডল্ফ নাম-করা মানুষ হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। খেটে যাচ্ছে ভূতের মত। না খেটে উপায় নেই। ডাক্তারটি কড়া মনিব। বড়ি পাকানো, মলম বানানো, পাঁচমিশেলী ওষুধে জল ঢেলে ঢেলে লাল নীল সাদা হরেকরকম মিক্চার তৈরি করা, এসব ব্যাপারে এক মিনিটের ঢিলেমি দেখলে নিপারসেন গর্জে ওঠেন—"তবেই হয়েছে তুমি ডাক্তার! কাজে ফাঁকি দিতে চাও যদি, বেরিয়ে যাও আমার ডাক্তারখানা থেকে।"

হায়! বেরিয়ে যাওয়ার উপায় যদি থাকত, ডল্ফ কি এক মিনিট দেরি করত বেরিয়ে যেতে? এ কাজ তার একদম ভাল লাগে না! এযাবৎ তার দিন কেটেছে মাঠে-ঘাটে দস্যিপনা করে করে। কখনও কোন পড়শীর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দেশবিদেশ ছুটে বেড়াচ্ছে ঝড়ের বেগে, কখনও বা হডসন নদের দুর্বার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে সাঁতার কাটছে এপার-ওপার, আবার এমনও কোন কোন দিন ঘটে গিয়েছে যে, কোন বন্ধুর বাবার বন্দুকটা কোন ফিকিরে হাতিয়ে নিয়ে সে গিয়ে ডুব মেরেছে গহন অরণ্যে। হরিণ-টরিণ তুচ্ছ প্রাণীর ত কথাই নেই, দুর্দান্ত বাইসন বা জাগুয়ার সামনে পড়লেও সে তার মোকবিলা করতে ভয় পায়নি সেদিন।

সেই ডল্ফ কিনা বুক-সমান-উঁচু টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পিল বানাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা? জীবনে ধিক্কার এসে গিয়েছে ওর। কবে সে এ শিক্ষানবিসিতে লাথি মেরে বেরিয়ে পড়ত রাস্তায়, যদি না তার লজ্জা করত অনাথা মায়ের দুঃখের অন্নে ভাগ বসাবার জন্য সেই মায়েরই কুঁড়েতে ফিরে যেতে।

লজ্জা করবে, পারবে না ডল্ফ মায়ের মনে কষ্ট দিতে। মা যে দিন গুনছে, কবে ডল্ফ ডাক্তার হয়ে বেরুবে, কবে সে দশজনের একজন হয়ে মাথা উঁচু করে বেড়াবে এই গ্রামে! ডল্ফ ভাগ্যকে অভিশাপ দেয়। তবু দিনের পর দিন পিল বানাতেই থাকে নিপারসেনের টেবিলে দাঁড়িয়ে।

বললে লোকে হয়ত বিশ্বাস করবে না, এইভাবে চব্বিশ ঘণ্টা নিজেকে শাপান্ত করতে করতেও পরিপূর্ণ চারটি বছর নিপারসেনের ডাক্তারখানায় কাটিয়ে দিল ডল্ফ হেলিগার। ডাক্তারি সে থোড়াই শিখেছে, ডাক্তার হওয়া তার ভাগ্যে আছে, এমন আশা ভুলক্রমেও সে কখনও করে না।

কুড়ি বছর বয়স হল ডল্ফের। গাঁট্টা জোয়ান সে এই বয়সেই। আর এই সময়ই ঘটল একটা ঘটনা।

দেদার পয়সা জমিয়েছেন নিপারসেন এই গাঁয়ে ডাক্তারি করে করে। কি করা যায় সে পয়সা দিয়ে? গাঁ থেকে মাইল তিন দূরে একটা বাড়ি সস্তায় বিক্রি হচ্ছে শুনে ঝট করে তিনি তা কিনে ফেললেন।

কিনবার পরে তাঁর চক্ষুস্থির। বাড়িটা যে হানাবাড়ি, সে খবর ত তাঁকে আগে কেউ বলেনি?

নিপারসেনের মতলব ছিল, বাড়িতে আপাততঃ এক ঘর চাষীকে তিনি বসাবেন। বাড়ির লাগোয়া জমিগুলো আবাদ করবে তারা। আধাআধি বখরা দেবে ফসলের ফি-বছর। কিন্তু দেখ বরাতের ফের, কোন চাষী ও বাড়িতে বসবাস করতে রাজী হয় না। এমনকি লাঙ্গল নিয়ে ও-বাড়ির জমিতে ঢুকতেও তারা নারাজ। "কাঁচা মুণ্ডুটা যমের হাতে কে তুলে দেবে মশাই?" সাফ জবাব দেয় সবাই।

ডাক্তার যখন বাড়ি নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন, ডল্ফ এল একটা প্রস্তাব নিয়ে—"বলেন যদি, আমি গিয়ে বাড়িটাতে বাস করি কিছুদিন। ভূত আমার করবে কী? আম ওখানে বাস করেও জ্যান্ত আছি—এটা যখন দেখবে চাষীরা, সাহস পাবে ওদিকে ভিড়তে।'

নিপারসেন ত লুফে নিলেন এ প্রস্তাব। নিজে তিনি যথেষ্ট বিশ্বাস রাখেন যে ভূতেরা ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারে মানুষের। বাড়ি কেনার অর্থটা বিলকুল লোকসান হতে বসেছে দেখেও নিজে গিয়ে ওখানে বাস করার কল্পনা এক মুহূর্তের জন্যও মগজে আসেনি তাঁর। হাজার হোক পয়সা লোকসান হলে তা একদিন কোন না কোনভাবে পূরণ হতেও পারে, কিন্তু জান লোকসান হয়ে গেলে তা আর পূরণ হবার ভরসা নেই কোনদিন। তবে ডল্ফ যেতে চাইছে, যাক না! হাজার হোক, নিজের জীবনে অন্যের জীবনে বহুৎ ফারাক। হ্যাঁ, যায় যদি ত যাক। কিন্তু ডল্ফ? সে যেতে চায় কেন? সে কি বিশ্বাস করে না ভূতে?

তা করে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ভগবানে আর ভূতে সমানভাবেই বিশ্বাস করতে শিখেছে। হ্যাঁ, বিশ্বাস করে, তবে ভয় করে না। করে না এই কারণে যে ভয় বস্তুটাই তার অস্থি-মজ্জায় কোথাও নেই। ভূত আছে, থাকুক, একটা শক্তসমর্থ মানুষের সে কী ক্ষতি করবে? আর বলতে কী, ভূতের

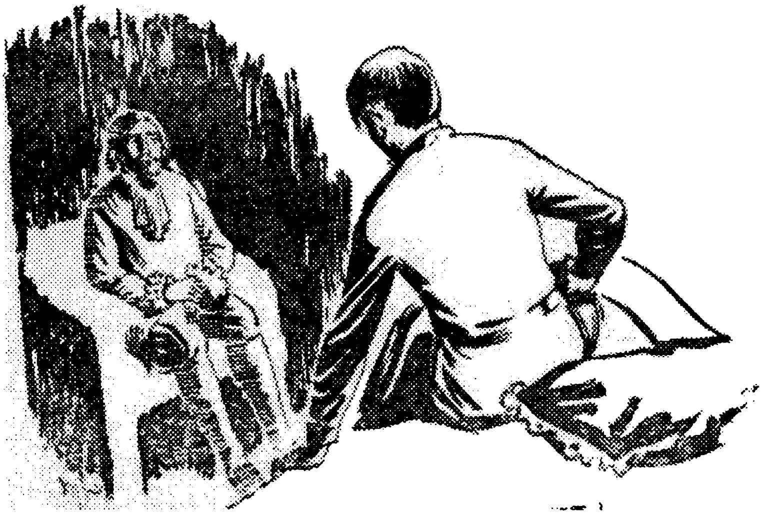

ভূত দেখছে ডল্‌ফকে, ডল্‌ফ দেখছে ভূতকে।

অস্তিত্বে ষোল আনা বিশ্বাস আছে বলেই ডল্‌ফ যেতে চাইছে হানাবাড়িতে। স্রেফ একঘেয়ে জীবনে একটুখানি বৈচিত্র্যের আশায়। পিল পাকিয়ে পাকিয়ে জীবনটাই যে বিস্বাদ লাগছে তার কাছে!

ডাক্তারের কাছে একটি শুধু অনুরোধ রাখল ডল্‌ফ, তার মায়ের কাছে এ খবর এক্ষুণি যেন না পৌঁছায়। যাক কিছুদিন। সব লোক যখন জানবে, মাও জানবেন আস্তে আস্তে। গোড়ায় জানতে পারলে মা একটা কান্নাকাটি জুড়ে দেবেন, একটা বিষম বাগড়া পড়ে যাবে ব্যাপারটাতে।

তাই হল। যথাসময়ে একদিন সন্ধ্যার পরে নিঃশব্দে হানাবাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল ডল্‌ফ। সঙ্গে গেলেন ডাক্তার নিজে তাঁর রাঁধুনীটিকে নিয়ে। বাড়িটা দেখিয়ে শুনিয়ে দেবার জন্য আর কি! একটা ঘর খুলে ডল্‌ফকে তার ভিতর স্থিতু করে দিয়ে ওঁরা দুজন ফিরে আসবেন। ডাক্তারের হাতে লণ্ঠন, রাঁধুনির হাতে একটা মোমবাতি, ডল্‌ফের বগলে একখানা কম্বল।

তিন মাইল পথ, এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেল সবাই। জায়গাটা এমন, দিনের বেলাও একা সেখানে গেলে গা ছমছম করার কথা। চারদিকেই ছোট ছোট পাহাড়। মাঝ বরাবর একটা নীচু উপত্যকায় ঐ একটি মাত্র বাড়ি। যথেষ্ট পুরোনো বটে, তবে ভেঙ্গেচুরে পড়েনি এখনো। আসবাবপত্র অনেকই রয়েছে, তবে সবই কেমন সেকেলে ধরনের। ওলন্দাজেরা যখন উত্তর আমেরিকার এই অঞ্চলটাতে প্রথম আসে উপনিবেশ গড়ে তুলবার জন্য, সেই যুগের।

বলাবাহুল্য ডল্‌ফেরাও ওলন্দাজ। এ ফ্যাশানের খাট বিছানা টেবিল চেয়ার গাঁয়ের ধনীদের বাড়িতে সে আগেও দেখেছে। কাজেই এ বাড়ির পরিবেশটা তার ঘরোয়া বলেই মনে হল। সেও একটা স্বস্তি।

অনেক লম্বা লম্বা বারান্দা পেরিয়ে, অনেক সরু সরু সিঁড়ি মাড়িয়ে ডাক্তার ডল্‌ফকে এনে তুললেন একখানা বৃহৎ শয়নকক্ষে! একপাশে বৃহৎ খাট, তাতে ছেঁড়া গদি। অন্যপাশে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড, তাতে আগুন নেই। কোথা থেকেই বা থাকবে? মাঝখানে একখানা বৃহৎ সোফা, তার উপরে আচ্ছাদনের কোন বালাই নেই। শক্ত কাঠে ধুলো জমে আছে রাশি রাশি।

ডল্‌ফ কম্বল বিছিয়ে ফেলল ছেঁড়া গদির উপরে। রাঁধুনী মোমটা জ্বেলে অগ্নিকুণ্ডের মাথায় বসিয়ে দিল। ডাক্তার বললেন—"দরোজা বন্ধ করে শুয়ে পড়। কেমন?"

এই বলেই লণ্ঠন এবং রাঁধুনী নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। ডল্‌ফ ঘরের দরজায় খিল এঁটে দিল এবং শুয়ে পড়ল হানাবাড়ির ছেঁড়া গদিতে। ভূতের কথাই ভাবছে সে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে সে ভাবনার সঙ্গে ভয়ের সংস্রব আদৌ নেই। যা আছে, তা হল কৌতূহল। গাঁয়ে ঘরে ভূত হচ্ছে একটা পহেলা নম্বরের আলোচ্য বিষয়। যদিও এমন কোন লোকের সঙ্গে ডল্‌ফের আজও পরিচয় ঘটেনি, যে নাকি নিজের চোখে ভূত দেখেছে। আজ যদি ডল্‌ফ নিজের চোখে তা দেখতে পায়, সে অবশ্যই নিজের বরাতের প্রশংসা করতে পারবে।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েই পড়ল ডল্‌ফ।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল তার হিসাব কে দেবে? হঠাৎই ভেঙ্গে গেল ঘুম। মোম তখনও জ্বলছে। সেই আলোতে ডল্‌ফ দেখল, এসেছে ভূত, সত্যিই এসেছে। ঘরে আর সে একা নয়। দরোজা যদিও আগের মতই খিলবন্ধ রয়েছে, তবু এক দশাসই লম্বা চওড়া আধবয়সী পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে হাড্ডিসার সোফার উপরে। পোশাক তার পুরোনো কালের ওলন্দাজদের মতই। লালচে চুল-দাড়ির বেষ্টনীর ভিতরে পাকাটে মুখখানা তার বড়ই যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

বেশ মনোযোগ দিয়ে দুজনে দুজনকে দেখছে। ভূত দেখছে ডল্‌ফকে, ডল্‌ফ দেখছে ভূতকে। ডল্‌ফ ভাবছে, ভূতটা যখন এসেইছে, কথা বলে না কেন? কিংবা ভয় দেখাবার মতলবে যদি এসে থাকে, ভেংচি-টেংচি কাটে না কেন? পরক্ষণেই তার মনে পড়ে গেল ভূতের ত রক্ত মাংসের দেহ নেই, যা দেখা যাচ্ছে, তা ছায়া বই আর কিছু নয়। ছায়া কথা কইবে কেমন করে? আর ভেংচি, ভয় দেখাবার জন্য ও হয়ত আসেইনি আদৌ।

তবে? ওর সঙ্গে আলাপ জমানো যায় কেমন করে?

খানিকটা ইতস্ততঃ করে বেশ মোলায়েম সুরেই ডল্‌ফ বলল—"দেখুন মিস্টার ভূত, আপনি যখন দয়া করে দেখা দিয়েছেন এ অধমকে, তখন অবশ্যই ধরে নিতে পারি যে আমার কাছে কোন দরকার আছে আপনার। সে দরকারের কথাটা চটপট বলে ফেললে ভাল হয় না কি? রাত এখনও খানিকটা আছে বোধহয়। আমি একটু ঘুমুতে চাই।'

নাঃ, জবাব নেই, মিস্টার ভূতের তরফ থেকে।

অতঃপর কী করা যেতে পারে, তাই ভাবছে ডল্‌ফ। এমন সময়ে ভূতটা উঠে দাঁড়াল সোফা ছেড়ে। হেঁটে গেল দুই পা, দরোজার দিকেই গেল। তারপর থামল, আর পিছন ফিরে তাকাল ডল্‌ফের দিকে। ডল্‌ফ যেন দেখল, ভূতের মাথাটা নড়ছে অল্প অল্প, যেন সে ইশারায় ডাকছে ডল্‌ফকে সঙ্গে আসবার জন্য।

ডল্‌ফ উঠে বসল বিছানার উপরে।

ভূত আবার দুই পা হাঁটল, আবার থামল, আবার ইশারা করল তেমনিভাবে।

নিশ্চয়ই ভূত এইটাই চাইছে যে ডল্‌ফ অনুসরণ করুক তার?

মতলব কী ভূতটার? ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে ডল্‌ফের। সে উঠে দাঁড়াল খাট থেকে, দুই পা সেও এগিয়ে গেল ভূতের দিকে। এবারে ভূতের মাথা বেশ জোরে জোরে নড়ছে, বেশ খুশী খুশী ভাব তার।

ভয়? ডল্‌ফ ও চিজটার সঙ্গে পরিচিত নয়। ভূত কেন তাকে সঙ্গে আসতে বলছে, জানবার জন্য দারুণ ব্যস্ত হয়েছে ও।

ভূত দরোজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আবার ইশারা করল ওকে, তারপর কী কাণ্ড! বেমালুম উবে গেল ডল্‌ফের চোখের সামনেই। ডল্‌ফ চোখ কচলাচ্ছে। সত্যিই উবে গেল নাকি? নাকি চোখের ভুল হচ্ছে ডল্‌ফের?

না, ভুল তার হয়নি। সত্যিই নেই ভূতটা।

অর্থাৎ সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ঘরে ঢোকার বেলায়ও বন্ধ দরোজার ভিতর দিয়ে সে ঢুকেছিল। বেরুবার বেলায়ও বন্ধ দরোজা তার গতি রোধ করতে পারেনি। কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার আগেও সে তৃতীয় বার ইশারা করে গিয়েছে ডল্‌ফকে। ডল্‌ফ কি ভয় পাবে তার সঙ্গে যেতে? আরে তাই কখনো হয় নাকি? ভয়? ছিঃ!

যেহেতু বন্ধ দরোজার ভিতর দিয়ে বেরুনো ডল্‌ফের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই সে খুলে ফেলল দরোজাটা। বাঃ! ঐ যে মিস্টার ভূত, ঠিক দুই পা সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন তার প্রতীক্ষায়!

তারপর সরু সরু সিঁড়ি আর লম্বা লম্বা বারান্দা বেয়ে বেয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভূতের অনুসরণ করল ডল্‌ফ। অবশেষে ভূত থামল আর একটা দরোজায়। তারপর আবার চট করে উবে গেল ওর সমুখ থেকে।

এবার আর ভেবে দেখবার কিছু নেই, ডল্‌ফ দরোজাটা খুলে ফেলল। ঠিক! ঐ ত দাঁড়িয়ে আছে ভূত। ডল্‌ফকে দেখেই সে আবার চলতে শুরু করল। এবার আর তারা বাড়ির ভিতরে নেই। খোলা উঠোন, তার পরে খানিকটা মাঠ। অনেক পথ পেরিয়ে বিশাল এক ইঁদারার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ভূত।

ডল্‌ফও আছে ভূতের পিছনেই।

ভূত আবারও ফিরে তাকাল ডল্‌ফের পানে। জ্যোছনায় ঝকঝক করছে চারিধার। ভূতের মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ডল্‌ফ। কী করুণ আবেদন বেচারা ভূতের মুখে-চোখে! কিছু একটা সাহায্য যে ডল্‌ফের কাছে ও চাইছে, তাতে ত আর কোন সন্দেহই নেই!

কী সাহায্য হতে পারে সেটা? হায়, বেচারা ভূত! তার ত কথা কইবার সামর্থ্য নেই!

এইবার আর এক কাণ্ড! ভূতটা ইঁদারার ভিতরে নেমে যাচ্ছে যে! আরে, কোথায় যায় ও? কোথায় যায়?

ডল্‌ফের দিকেই দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ভূতটা ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে ইঁদারায়। এইবার তার কোমরের নীচের সবটা অদৃশ্য হয়ে গেল। এইবার বুক। এইবার কাঁধ—

আর একটা মিনতিভরা ইশারা, তারপর ভূত অদৃশ্য।

ভূতটা পাগল নাকি? ওর ঐ শেষ ইশারা শিরোধার্য করে ডল্‌ফও ইঁদারায় নামবে, এরকমটা যদি ও প্রত্যাশা করে থাকে, তবে ডল্‌ফ বলবে, ভূতটা নেহাতই ভূত। ওর কোন আক্কেল নেই।

না, নামবে না ডল্‌ফ নিশ্চয়ই। তবে ইঁদারার উপর থেকে ঝুঁকে পড়ে যতটা সম্ভব দেখে নেবে ওর নীচের অবস্থাটা। ভূত কি এখনও নামছে, না উবে গিয়েছে?

উঁচু গাঁথুনি দিয়ে ঘেরা রয়েছে ইঁদারার মুখ। ডল্‌ফ এসে সেই গাঁথুনির উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল। চাঁদের আলোতে ইঁদারার নীচের দিকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। জল চকচক করছে জোছনায়, তবে বহু বহু নীচে। আর ভূত? বেমালুম হাওয়া! সে ঐ পাতালে ডুব মেরেছে নিয্যস। এই পাতালেই থাকে না কি ও? অমন ইট পাথরের মোকাম পছন্দ নয় ওর!

যাক সে কথা, এ রাত্রে ডল্‌ফের আর কিছু করবার নেই। সে গুটি গুটি ফিরে গেল বাড়ির ভিতরে, তার শোবার ঘরে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, যেন সে দড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে ইঁদারার ভিতরে—যাচ্ছে—যাচ্ছে একদম পাতালে নেমে যাচ্ছে—

কী যেন একটা কী পাতাল থেকে তুলে আনবার জরুরী তাগিদ রয়েছে তার। না আনলে যেন কিছুতেই চলবে না। জিনিসটা যেন তারই, তার ছাড়া আর কারুর নয় যেন—

তারপর স্বপ্নেই সে আবার দেখল, সেই বিষণ্ণ-বদন ভূতটাকে। সে যেন ঠোঁট নাড়ছে, ডল্‌ফের কানে যেন ভূতের কথা স্পষ্ট ধরা পড়ছে—"ওটা তোমারই। একটু মেহনত করে তুমি ওটা তুলে আন বাবা! তুমি ত ভীতু নও।"

ঘুম ভাঙ্গতেই ডল্‌ফ দেখল, রাত ভোর হয়ে এসেছে। সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল বাড়িটা থেকে, লোকজন জেগে ওঠার আগেই নিপারসেনের ডাক্তারখানায় তাকে পৌঁছোতে হবে। সে যে হানাবাড়িতে রাত্রি যাপন করেছে, এটা আপাততঃ কাউকে জানান চলবে না—

"না, কিছু দেখিনি। অঘোরে ঘুমিয়েছি সারা রাত।" ডাক্তারের নানা প্রশ্নের জবাবে সাফ জবাব দিয়ে দিচ্ছে ডল্‌ফ— "ভূত ত দূরে থাকুক একটা ছারপোকা পর্যন্ত কামড়ায়নি স্যার!"

বরাত ভাল ডল্‌ফের, দিনের ভিতর এক সময় গ্রুট এল ডাক্তারের বাড়িতে বেড়াতে। ডল্‌ফ কোনদিন যা করেনি, তাই করল আজ। মুখটা কাঁচুমাচু করে গ্রুটকে বলল—"কাকা, বড্ডো মুশকিলে

Suk—June-5

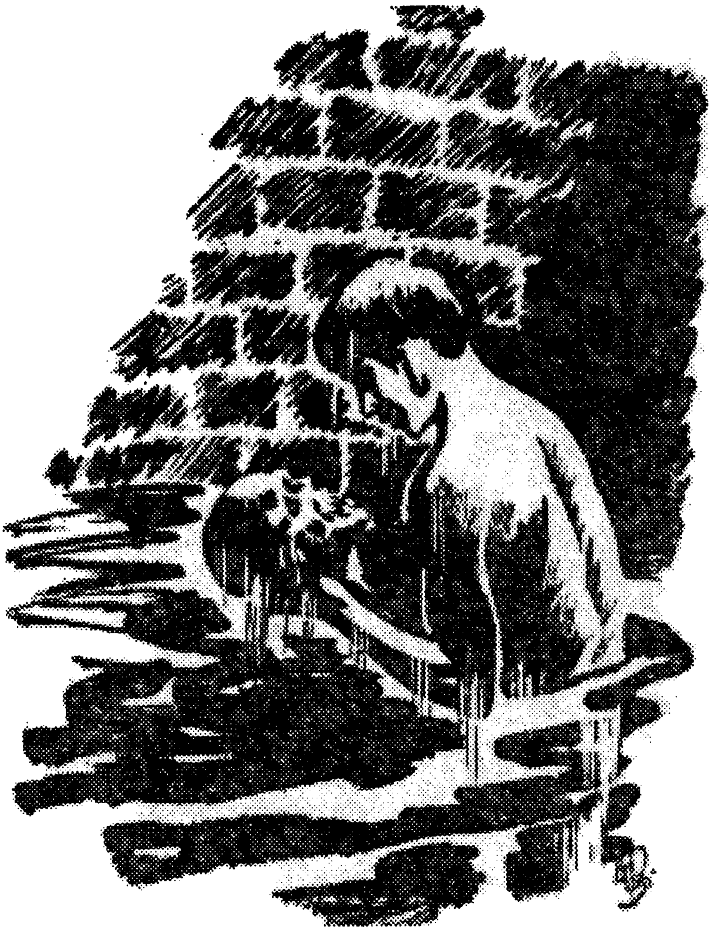

চাঁদের আলোতে জিনিসটা দাঁত বের করে হেসে উঠল ডল্‌ফকে দেখে।

পড়েছি, কিছু পয়সা আমায় দেবে?"

কোনদিন যে পয়সা চায়নি, সে আজ চায় কেন? গ্রুট অবাক্‌। তবু, গ্রুট ভালবাসে ছেলেটাকে। বিমুখ করতে পারল না তাকে। পকেটে যা ছিল, সব ঝেড়ে ডল্‌ফকে দিয়ে দিল।

সন্ধ্যা হতে না হতেই ডল্‌ফ বেরিয়ে পড়ল একটা মোমবাতি নিয়ে। আজ ত আর পথ দেখাবার জন্য ডাক্তার বা রাঁধুনীর যাওয়ার দরকার নেই তার সঙ্গে।

ডল্‌ফ বেরুলো, কিন্তু সোজাসুজি হানাবাড়ির দিকে না গিয়ে উঠল গিয়ে গাঁয়ের মুদিখানার দোকানটাতে। ওরা গেরস্তালির হরেকরকম জিনিসই মজুদ রাখে সারা বছর। কার কখন কী দরকার হয়ে পড়ে, বলা যায় কী!

আজ ডল্‌ফের দরকার কয়েকগাছা মজবুদ দড়ি। ডাক্তারের গরু বাঁধবার দড়িগুলো বিলকুল পচে গিয়েছে। একটা একটা করে ছয়গাছা দড়ি সে বেছে নিল। দাম মিটিয়ে দিল গ্রুটের পয়সা দিয়ে।

হানাবাড়িতে পৌঁছে ডল্‌ফের কাজ হল আজ, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়া নয়, ইঁদারার পাশে বসে খাটো দড়িগুলো জোড়া দিয়ে দিয়ে একটা পেল্লায় লম্বা দড়ি বানানো। তা ছাড়াও, সেই পেল্লায় লম্বা দড়ির মাঝে মাঝে এক একটা গেরো দেওয়া। নামবার সময় ঐসব গেরোতে হাত রাখা চলবে এক-আধ মিনিটের জন্য, গেরোতে পা বাধিয়ে জিরোনোও চলবে দরকার মত।

ইঁদারা থেকে সামান্য দূরে একটা বাবলা গাছ। কালই তা লক্ষ্য করেছিল ডল্‌ফ। সেই গাছের গুঁড়িতে শক্ত করে দড়ির এক মাথা বেঁধে ফেলল সে। তারপর দড়ি ঝুলিয়ে দিল ইঁদারার ভিতর। জলের তলাতেও দড়ি নেমে গেল অনেকদূর। এইবার ডল্‌ফ জামা- কাপড় ছেড়ে রাখল বাবলার তলায়, আর 'জয় যীশু' বলে নেমে পড়ল দড়ি ধরে।

শীতের দিন নয়, তবু শীত-শীত করছে বই কি! কেমন যেন শিউরে শিউরে উঠছে দেহের ভিতরে। শীত? না ভয়? ভয়? ধ্যুৎ! কিন্তু শীতও না। তবে কী এটা?

যা খুশী তা হোক, ডল্‌ফ সড়সড় করে নামছে। মাঝে মাঝে জিরিয়ে নিচ্ছে দড়ির গিঁঠ ধরে ধরে, যাতে নতুন দড়ির ঘষায় হাতের চামড়া ছড়ে না যায়। কিন্তু কতক্ষণ আর? নামতে শুরু করার একটু পরেই ডল্‌ফ দেখল সে জল ছুঁয়েছে। যদিও উপর থেকে মনে হয়েছিল, গভীর ইঁদারার তলায় পৌঁছুতে সময় লাগবে অনেক।

বরাত জোর, কুয়োর জল গরম। যতক্ষণ খুশী ও থাকতে পারবে এ জলে। কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে।

জল গভীরও। দশ-বারো ফুট ত বটেই। ডল্‌ফ দড়ি ছেড়ে দিয়ে ডুব দিল জলে। পচা গন্ধ অবশ্য জলটাতে। তা সে ত স্বাভাবিক! কেউ নাড়ে চাড়ে না এ-জল!

ডুব! ডুব! ডুবিয়ে হডসনের তলা থেকে মাটি তুলে আনে ডল্‌ফ, দশ-বারো ফুট জলের তলায় পৌঁছে মাটি হাতড়ে দেখা তার পক্ষে শক্ত কত! প্রথমবার গোল-পানা একটা কী পিছল জিনিস হাতে ঠেকতেই সেটা তুলে নিয়ে ভুচ্‌ করে জলের উপরে ভেসে উঠল ডল্‌ফ!

চাঁদের আলোতে জিনিসটা দাঁত বার করে হেসে উঠল ডল্‌ফকে দেখে। কী সর্বনাশ! মড়ার মাথা একটা, সাদা হাড় শ্যাওলায় সবুজ হয়ে গিয়েছে এখানে ওখানে।

এমন চমকে উঠেছিল ডল্‌ফ যে মড়ার মাথাটা তার হাত থেকে ফসকে জলে পড়ে গেল আবার। সে ভাবতে লাগল—জলে ভাসতে ভাসতে অনেক

কথাই মাথায় আসছে তার।

ভূত মশাইয়ের মতলবখানা এবার যেন বোঝা যাচ্ছে একটু একটু। এইখানে ইঁদারার জলে পড়ে আছে তার হাড়গোড়গুলো। গির্জার আঙ্গিনায় কবর না পাওয়ার দরুন আত্মা শান্তি পাচ্ছে না তার। ডল্‌ফকে ডেকে আনার ভিতরে ভূতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে ও তার হাড়গুলোকে তুলে নিয়ে খ্রীষ্টধর্মের বিধানমতে কবর দিক।

বড় চাট্টিখানি কথা নয় মিস্টার ভূত! বহুৎ ঝামেলার ব্যাপার ওটা।

তবু, নেমে যখন আসাই গিয়েছে, নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়া ভাল। মাথাটাই ডল্‌ফ পেয়েছে এযাবৎ। ধড়টাও এখানেই আছে ত? এমন যদি হয় যে ধড়টা এখানে নেই। শুধু কাটা মুণ্ডুটাই পড়ে আছে। তাহলে ডল্‌ফ এক্ষুণি সেটাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। লুকিয়ে রাখতে পারে অন্য কোথাও দুই-একদিন, তারপর গ্রুটকে খোসামোদে রাজী করিয়ে গির্জার হাতায় একটা গর্ত করে—

সে পরের কথা। আগে জানা দরকার সত্যিকার অবস্থাটা। ডল্‌ফ আবার ডুব দিল। যাচ্চলে! একটা আংটার ভিতর হাত ঢুকে গেল ডল্‌ফের। কিসের আংটা হতে পারে? বালতির? কড়ার? সিন্দুকের ডালার?

না, সিন্দুক নয়, জিনিসটা হালকা। অনায়াসে এক হাতেই ওটা উঁচু করে তুলে ফেলল ডল্‌ফ। জলের উপরে ভেসে উঠে দেখল, একটা বালতির মতই বস্তু, মাঝারি আকারের। কী থাকতে পারে এতে? বালতির মুখে একখানা থালা চাপা দেওয়া রয়েছে, সরু তার দিয়ে তা আবার বালতির সঙ্গে মজবুদ করে বাঁধা।

কী থাকতে পারে এর ভিতর?

বালতিটা দড়ির শেষ মাথায় বেঁধে ফেলল ডল্‌ফ, ওঠার সময় উপরে নিয়ে যাবে। তারপরে হাড়গোড়ের সন্ধানে আবার দিল ডুব। উঠল বই কি! বড় ছোট নানা আকারের হাড়ের টুকরো উঠতে লাগল একটার পরে একটা। মানুষটাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ইঁদারায় ফেলে দিয়েছিল কোন ডাকুর দল। কী জন্য? ঐ বালতিটার জন্যই কি?

হাড়গুলো আপাততঃ থাকুক। বালতিটা নিয়ে যাওয়া যাক। রহস্যের সমাধান হয়ত ওরই ভিতরে আছে।

ডল্‌ফ আগে নিজে উপরে উঠল দড়ি বেয়ে। তারপরে বালতিসুদ্ধ দড়িটাও তুলল টেনে। প্রথম কাজ জামাকাপড় পরে নেওয়া, তারপর বালতি আর দড়ি নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়া। সেখানে দরোজা বন্ধ করে বালতি খুলে দেখা—

খুলে যখন দেখল, ডল্‌ফের চক্ষু স্থির। এক বালতি মোহর বালতির ভিতর। আর একটা পিতলের মজবুদ কৌটো, সেটা খুলতে রীতিমত বেগ পেতে হল ডল্‌ফকে। এমন ভাবে তা বন্ধ করা, যাতে জল ঢুকতে না পারে কৌটোতে।

তবু অনেক চেষ্টায় তা খুলে ফেলল ডল্‌ফ। আর কিছু নয়, একখানা চিঠি। ওলন্দাজ ভাষায় তাতে লেখা—

"মাত্র আঠারো বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিলাম পয়সা করবার জন্য। কালিফোর্নিয়ায় নদীর চড়ায় বালি ধুয়ে ধুয়ে সোনার কণা বার করেছি, প্রায় কুড়ি বছর ধরে। তারপর শহরে গিয়ে বেচলাম সেই সোনার কণাগুলি। মন্দ দাম হল না। তারপর শুরু করলাম লগনির ব্যবসা, চড়া সুদে। বছর দশেক রইলাম সে ব্যবসা নিয়ে। তারপর বাড়ির জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠল, ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে এক বালতি মোহর কিনে ফেললাম সর্বস্বের বিনিময়ে।

"বাড়ি এসে দেখি আপনার জন সব মরে গিয়েছে, তবে একটা ছোট বোন নাকি বেঁচে আছে হডসনের কূলে ক্যাটস্কিল পাহাড়ের আনাচে-কানাচে কোন এক জায়গায়। তার স্বামীর নাম গুস্টেড হেলিগার—"

এই পর্যন্ত পড়েই চমকে আঁতকে একবারে লাফিয়ে উঠল ডল্‌ফ। গুস্টেড হেলিগার ত তারই বাবার নাম! এ চিঠি যার লেখা, সে তা হলে সাক্ষাৎ মামা ডল্‌ফের? হ্যাঁ, মনে পড়ছে ত! তার মা ত মাঝে মাঝেই তার এক নিরুদ্দেশ মামার গল্প করে থাকে। কী নাম ভাল? স্পিগেল! ফিলিয়ান ভ্যাণ্ডার স্পিগেল!

চিঠির নীচেও এই যে নাম সই রয়েছে "ফিলিয়ান ভ্যাণ্ডার স্পিগেল"!

নিজের উত্তেজনা নিজেই কোন-রকমে শান্ত করল ডল্‌ফ। তারপরে পড়ে ফেলল চিঠির বাকী অংশটা। খুঁজতে খুঁজতে স্পিগেল এই বাড়ি পর্যন্ত এসে পড়েছিল। হঠাৎ ঝড়বাদলা শুরু হল বলে আশ্রয় নিল এই বাড়িতেই রাতটার জন্য। কিন্তু তাইতেই হল সর্বনাশ। মালিকেরা কেউ উপস্থিত ছিল না এখানে, ছিল একপাল চাকর-বাকর। তারা কেমন করে যেন টের পেয়ে গেল যে বালতিতে সোনা ভর্তি।

আর তারা যে টের পেয়েছে, তা বুঝতেও পারল স্পিগেল। তার মনে নিশ্চিত ধারণা হল যে রাতের ভিতরেই তাকে খুন করে ঐ চাকরেরা তার সোনা লুঠ করবে।

"কী করব? কেমন করে রক্ষা পাব এ সংকটে?"—এই ভাবতে ভাবতে স্পিগেল লিখে ফেলেছিল এই চিঠিটা। "কেমন করে রক্ষা পাব"—এই কথাতেই চিঠি শেষ।

না, রক্ষা সে পায়নি।

চিঠি লেখার পরের ঘটনাগুলো ডল্‌ফ অনুমান করেই নিল। চিঠি কৌটোয় বন্ধ করে বালতিতে রেখে সেই তুমুল ঝড়বাদলায় বাড়ির আশ্রয় ছেড়ে হয়ত বেরিয়ে পড়েছিল মামা। চাকরগুলোও হয়ত সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করেছিল পিছনে। পালাবার মুখে বালতিটা লুকিয়ে ফেলবার জন্যই হয়ত বেশী ব্যস্ত হয়েছিল স্পিগেল। তাই ইঁদারাটা দেখতে পেয়ে ওটা ফেলে দিয়েছিল তারই ভিতরে।

তারপরে চাকরগুলোও হয়ত তাকে ধরে ফেলেছিল, আর মোহর না পাওয়ার দরুন রাগের মাথায় স্পিগেলকে খুন করে ফেলে দিয়েছিল ঐ ইঁদারাতেই।

সে যাই হোক, মামার অর্থ ভাগনেই পেয়েছে। পাতাল থেকে তুলে এনে মামাকে যথা শাস্ত্র কবর দেবেই ডল্‌ফ।

---

* ওয়াশিংটন আর্ভিং-এর ভৌতিক গল্প "ডল্‌ফ হেলিগার" অবলম্বনে।

ফকিরচন্দ্র বটব্যাল স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার

প্রথম পুরস্কৃত গল্প

আত্মজা

সুপ্রসা রায়

তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে হাওড়া-ধানবাদ কোলফিল্ড এক্সপ্রেস। অন্ধকার ফুঁড়ে, নৈঃশব্দ্য চিরে রাগী, একগুঁয়ে যন্ত্রদানব ছুটছে। সামনে কোনো বাধা এলে যেন পিষে দিয়ে চলে যাবে।

রাত সাড়ে ন'টা। কুমারধুবি স্টেশনকে পিছনে ফেলে ধানবাদের দিকে এগোচ্ছে ট্রেনটা। অনেক যাত্রীই তাদের রাতের আহার সেরে নিচ্ছে। কেউ ঝিমোচ্ছে। কারও কারও হাতে প্ল্যাটফর্মের হুইলার থেকে কেনা রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকা। কেউ বা অলসভাবে জানলায় চোখ ফেলে রেখেছে। জানলার ফ্রেমের ওপারে গতিময় মিশকালো পটভূমিকায় হঠাৎ হঠাৎ আলোর ঝলক। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘর-বাড়ি। দূরে কোনো কয়লা খনির চিমনি থেকে বেরোতে থাকা অগ্নিভ-ধোঁয়া।

যাত্রীদের ভেতরে আলস্য যতখানি, ট্রেনের ব্যস্ততা তার চেয়ে অনেক বেশি। আশপাশের দৃশ্য দেখে নষ্ট করার মতো সময় নেই। নির্দিষ্ট সময়ে পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছোতে না পারলে আভিজাত্যে কলঙ্কের দাগ পড়বে। ব্যাহত হবে সুনাম। অতএব কর্তব্য সমাধা করে তবেই বিশ্রাম।

হঠাৎ প্রধান চালকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। হেডলাইটের পরিধির ঠিক ওপারে যেন কিছু একটা নড়া-চড়া করছে। সহকারীকে বলতেই তিনিও আঁতকে উঠলেন, বিশ্বাসদা, মনে হচ্ছে একটা বাচ্চা।

ট্রেন ততক্ষণে আরও খানিকটা এগিয়ে গেছে। স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটা ছোট্ট মেয়ের অবয়ব। বিশ্বাসদা চেঁচিয়ে উঠলেন, সর্বনাশ, হর্ন দাও বিজয়, হর্ন দাও। বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন যেন আর্তনাদ করে উঠল, 'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও।'

ছোট্ট মেয়েটির সরে যাবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ট্রেনের হর্নের আওয়াজে চমকালও না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, ছোট্ট দুটো হাত মাথার ওপরে তুলে ইশারায় ট্রেনটিকে এগোতে নিষেধ করছে। ওর মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। পরিধানের ধবধবে সাদা জামা, আর হাতে ধরা একটা সাদা কাপড়ের টুকরো ওকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

তীব্র গতির যান, নিয়ন্ত্রিত করতেও সময় লাগে। বিশ্বাসবাবু অন্ধকারের ভেতর কিছু খুঁজলেন। এখানে আলো হাতে গেটম্যানের দাঁড়িয়ে থাকার কথা। সে থাকলেও না হয় বাচ্চাটাকে সরিয়ে দিত। কোথায় ভাঙ খেয়ে পড়ে আছে হয়তো। দাঁতে-দাঁত পিষলেন বিশ্বাসবাবু।

অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ট্রেন থামালেন বিজয়। বিকট শব্দ করে, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে প্রায় মেয়েটার সামনে এসে দাঁড়াল ট্রেনটা। লাফ দিয়ে নামলেন দুজন। দ্রুত মেয়েটার কাছে গিয়ে রাগতস্বরে বিশ্বাসবাবু বলেন, এটা কী তোর খেলার জায়গা? চাপা পড়লে বুঝতিস।

বছর দশেকের দেহাতি মেয়ে, তেল-জবজবে চুল, চোখেমুখে গভীর উদ্বেগ। নিঃশব্দে আঙুল তুলে পেছন দিকে দেখায়। কৌতূহলে সেদিকে চোখ ফেলতেই ওঁদের রক্ত হিম। লাইনের

ওপর গোটা দুয়েক ফিশ-প্লেট খোলা। ট্রেনটা ওখানে পৌঁছলেই মুহূর্তে তালগোল পাকিয়ে যেত। ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেত যাত্রীদের দেহ। এই জন্যই মেয়েটা হাত নেড়ে ট্রেনটা থামাল? ও নিজেই চাপা পড়ে যেতে পারত। সাংঘাতিক দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এতগুলো প্রাণ বাঁচিয়েছে ছোট্ট মেয়েটা।

কাছে এসে বিশ্বাসবাবু জানতে চান, তোর নাম কী রে? লাজুক হেসে মেয়েটি বলে, জী পুনম।

এভাবে চলন্ত ট্রেনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলি, ভয় করেনি?

পুনম গলায় জোর দিয়ে বলে, আমার ভয় করে না।

থাকিস কোথায়?

এখানেই। এখানকার গেটম্যান শিউপূজন যাদব আমার বাবা।

এইবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। বাচ্চা মেয়েটাকে ডিউটিতে পাঠিয়ে, নিজে নিশ্চয় নেশা করছে। কড়া গলায় বিশ্বাসবাবু বলেন, তোর বাপটা তো আজব লোক। নিজে ডিউটিতে ফাঁকি দিয়ে তোকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

বিষণ্ণমুখে পুনম বলে, না বাবুজী, আমার বাবা কখ্খনও ডিউটিতে ফাঁকি দেয় না। বাবা তো কাজকে ভগবানের পূজা বলে মানে। বাড়ির লোকের অসুখ করলেও বাবার কাছে আগে ডিউটি, পরে ডাক্তার আনা।

তাই বুঝি? তাহলে এখন সে গেল কোথায়?

বাবা তো জ্বরে বেহুঁশ। এদিকে গাড়ি আসার সময় হয়ে গেল। লাইন খোলা। গাড়ি ওখান দিয়ে গেলেই অ্যাক্সিডেন্ট হবে। তাই আমিই জলদি করে সাদা জামাটা পরে চলে এলাম, যাতে অন্ধকারেও সাদা জামাটা দেখে তোমরা গাড়ি থামাতে পার।

ওর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন ওঁরা। এইটুকুনি মেয়ে, স্রেফ বুদ্ধির জোরে ট্রেনসুদ্ধ এতগুলো যাত্রীকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। অফিসে খবরটা জানিয়ে আগামী প্রজাতন্ত্র দিবসে ওকে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কথাটা শুনেই প্রবল আপত্তি জানায় পুনম, না-না বাবুজী, ইনাম যদি দিতে হয়, আমার বাবাকেই দেবেন।

কেন রে, এতগুলো লোকের প্রাণ বাঁচালি তুই, আর ইনাম দেব তোর বাবাকে?

পুনম হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল, বাবুজী, আমার বাবা খুব মন লাগিয়ে ডিউটি করে বলে আগেও অনেক ইনাম পেয়েছে। একবার তো আমার খুব ভারি অসুখ করল। মা অনেকবার বলল ডাক্তার আনতে। বাবা বলল, আগে গাড়িটা পাস করিয়ে আসি। আমার তখন দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। মা খুব কাঁদল। বাবা আমাকে বলল, বেটি, এক গাড়ি লোক আমার ভরসায় সফর করছে। আমি গিয়ে বাতি না দেখালে যদি কোনো বিপদ হয়। তো আমি বললাম, তুমি যাও বাবা, গাড়ি পাস করিয়ে এস। সেবারও এমনি এক বিপদ থেকে ট্রেনটা বাঁচিয়েছিল বাবা। গরমিন্ট মেডেল দিল।

কিন্তু এবার তো তুই আমাদের বাঁচালি।

না বাবুজী, আমার ভিতর দিয়ে বাবাই কাজটা করল।

জানো কী!

- ☐ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। অন্ধকার ধীরে ধীরে তার আঁচল বিছিয়ে দিতে থাকে। ঘাসবনকে মনে হয় দুর্ভেদ্য আমাজনের অরণ্য। জিপের ড্রাইভার আর এগোতে চায় না। যশোধরা প্যাটেল তাকে সরিয়ে দেন। বলেন, আমি গাড়ি চালাব........
- ☐ কনকর্ডের চারটে ইঞ্জিন তখন গর্জন করছে। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে দেখা যাচ্ছে। ওড়ার নির্দেশ পেয়েই দৌড় শুরু করল বিমানটি। নির্বিঘ্নে আকাশে ওড়ার পরই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি দেখতে পেল কন্ট্রোল টাওয়ারের কর্মীরা......
- ☐ বিজিতের কথাটা বিশ্বাস হয় না শমীকের। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবিশ্বাসও করতে পারে না। বিজিত যে তার বন্ধু, তার সহপাঠী.......
- ☐ রাজপুত্রের বিয়ের যখন তোড়জোড় চলছে তখনই বেঁকে বসল পাত্র স্বয়ং। রূপাঞ্জলির ছবি দেখে রাজপুত্র মুগ্ধ। রূপ তো নয় যেন সূর্যের আলো। সেখানে চন্দ্রাবতী মিটমিট করে হাসছে দূরের তারার মতো। রাজপুত্রের দু. চোখে তখন শুধু রূপাঞ্জলি.....কিন্তু.......

এইসব প্রশ্নের উত্তর পাবে শুকতারার **শ্রাবণ** সংখ্যায়। সঙ্গে আরও অনেক কিছু। হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল, বাহাদুর বেড়াল আর বিচ্ছু তো আছেই।

আমাকে ইনাম দিলে সবাই জানবে বাবা ডিউটি করেনি। খুব বদনাম হবে বাবার।

বাবাকে খুব ভালোবাসিস না রে?

মাথা নিচু করে ঘাড় নাড়ে পুনম।

ট্রেন চালু হতে তো সময় লাগবে। চল তোর বাবাকে দেখে আসি।

ইতিমধ্যে নিজের কেবিন থেকে গার্ডসাহেব এসে গেছেন। অনেক যাত্রীও নেমে এসেছে। ছোটোখাটো একটা দল পুনমের সঙ্গে শিউপূজনকে দেখতে গেল। সামনেই একটা লেভেল-ক্রসিং। পাশেই গেটম্যানের গুমটি ঘর। কাছাকাছি এসে পুনম থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তোমরা যাও বাবুজী, আমি ঘরে যাব না।

বিশ্বাসবাবু ওর হাতটা ধরলেন, কেন রে?

আমি যে লাইনধারে গেছিলাম, বাবা জানে না।

তোর কোনো ভয় নেই। আমরা তোর বাবাকে বলব, তুই আজ কত লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছিস।

তোমরা আগে যাও। আমি পরে যাচ্ছি।

সস্নেহে হেসে বিশ্বাসবাবু দলবল সহ ঘরে পা দিলেন। কালিপড়া লণ্ঠনের আবছা আলোয় খাটিয়ার ওপর মলিন বিছানায় শুয়ে ধুঁকছে শিউপূজন যাদব। ওর স্ত্রী পাশে বসে বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। আচমকা এতগুলো লোককে ঘরে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি একগলা ঘোমটা টেনে খাটিয়ার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। শিউপূজন অতিকষ্টে চোখের পাতা খুলে উর্দিপরা চালক, গার্ডদের দেখে উঠে বসতে গেল। দুর্বল শরীর সহযোগিতা করল না। গার্ড সাহেব বাধা দিয়ে উঠতে বারণ করলেন ওকে। শিউপূজন ডুকরে উঠে বলে, আপনাদের দেখেই আমি বুঝেছি সাহেব, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কিসের সর্বনাশ?

কাঁদতে-কাঁদতেই শিউপূজন বলে, আমি সময় মতো গেট ফেলিনি, বাতি দেখাইনি। আমার দোষেই অ্যাক্সিডেন্ট হল। আমাকে সাজা দিন সাহেব।

ওর উৎকণ্ঠা দেখে হেসে ফেলেন সবাই। বিশ্বাসবাবু ওর ভুল ভাঙিয়ে বলেন, আরে তুমি না পারলে কী হবে; তোমার মেয়ে আজকে খুব বড় অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে।

আমার মেয়ে! কান্না ভুলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে শিউপূজন। মাথা থেকে ঘোমটা খসে গেছে পুনমের মায়ের। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে সেও। পুনম কীভাবে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, ট্রেনটাকে দুর্ঘটনার কবল থেকে বাঁচিয়েছে, বিশ্বাসবাবুদের মুখ থেকে সেই বর্ণনা শুনে পুনমের মা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে, বিটিয়া রে! শিউপূজনের চোখ দিয়েও জল গড়াচ্ছে। সকলেই হতভম্ব। মেয়ের কীর্তিতে উল্লসিত না হয়ে কাঁদছে কেন, কেউ বুঝে উঠতে পারছেন না।

খানিক পরে, ধীরে-ধীরে শিউপূজন বলে—আমার বিটিয়া জানে, ডিউটিতে ফাঁকি দিলে আমি মরেও শান্তি পাব না। আর আমার এত বছরের কাজের সাদা রেকর্ডে কালো ছাপ্পা পড়ে যাবে। তাই বাপের নাম বাঁচাতে ও নিজেই গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিউপূজন তখনও চোখের জল মুছছে। বিশ্বাসবাবু জানতে চান, কিন্তু তোমরা কাঁদছ কেন? তোমার মেয়ের তো কিছু হয়নি। এমন মেয়ের বাপ-মা হওয়ায়, তোমাদের তো গর্ব হওয়া উচিত।

চোখের জল মুছে শিউপূজন বলে, ঠিক বলেছেন সাহেব। আমাদের গর্ব হওয়া উচিত। জানেন সাহেব, ক'মাস আগে আমিও একটা ট্রেনকে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাঁচিয়েছিলাম। বিটিয়ার ওইদিন তবিয়ত খুব খারাপ। ডাক্তার ডাকা খুব দরকার। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, আমি লাইন কিলিয়ার বাতি দেখিয়ে ট্রেনটা পাস করিয়েই ডাক্তার ডেকে আনব। বিটিয়া বলল, বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি যাও। একগাড়ি লোক তোমার ভরসায় বসে আছে। ট্রেনটাকে বাঁচিয়ে ডাক্তার আনতে একটু দেরি হয়ে গেল। এর মধ্যে উপরওয়ালার গেটম্যান এসে আমার বিটিয়াকে লাইন কিলিয়ার বাতি দেখিয়ে, পাস করিয়ে দিয়ে গেছে।

হাউ-মাউ করে কাঁদছে শিউপূজন, ওর বৌ। শ্রোতারা নির্বাক। শিউপূজন আবার বলে, জানেন সাহেব, ওই ঘটনায় গরমিন্ট আমাকে মেডেল দিয়েছিল। সাহেব, সেদিন আমি ওকে বাঁচাতে পারিনি। আজ কিন্তু ও আমাকে পাপের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

ফকিরচন্দ্র বটব্যাল স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

কাজের মাসি

সোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

অমলামাসি, কাজের মাসি। সোনুদের বাড়িতে সবসময়ের জন্য কাজ করে। সারাদিনের কাজ শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যায়। হলদি নদীর পশ্চিম পাড়ে নন্দীগ্রাম। সেখানে অমলামাসির বাড়ি। সোনু যখন কেজিতে পড়ে তখন অমলামাসি সোনুদের বাড়িতে কাজে লাগে। সোনু এখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। হলদিয়া সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। সোনুর মা প্রথম দেখাতেই অমলামাসিকে কেন যেন খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। আর অমলামাসিও এই সুদীর্ঘ আট বছরে সেই বিশ্বাসের মর্যাদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

অমলামাসি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। দেখলেই একটা মা, মা ভাব আসে মনে। অমলামাসি বিবাহিতা কিন্তু কোনো সন্তানাদি নেই। সন্ধ্যার খেয়ায় বাড়ি ফিরে রান্না করে রাত্রের জন্য। সেই রান্না করা খাবারে তার স্বামীর পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। অমলামাসির স্বামী মাঠে মজুরের কাজ করে।

সোনুর বাবা কর্মসূত্রে আসানসোলে থাকেন। মা হলদিয়ার

এতবড় দুঃসংবাদ আমায় বলোনি কেন?

একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। স্বাভাবিকভাবেই সোনুর কাছে অমলামাসি তার নিজের মাসির মতো। তার অনেক আবদার, দাবি—বিশেষ করে স্নান-খাওয়া-দাওয়া নিয়ে, অমলামাসিই সামলায়। মা বিকালে বাড়ি ফেরেন, সোনু স্কুল থেকে ফেরার একটু পরে।

অমলামাসিও সোনুকে সন্তানস্নেহে পালন করে। কোনো সময় স্কুল ছুটি থাকলে সোনুর মা অমলামাসিকে বলেন, অমলা, তুমি দু-দিন বিশ্রাম নাও, তারপর আবার এসো। এ-ক'দিন ছুটি আছে, আমি সামলে নেব। অমলামাসি বলে, তুমি পারবেনি দিদি। এত্ত কাজ। এত কাচাকুচি, রান্নাবান্না, খোকনের কষ্ট হবে গো।

সোনুর মা আর কিছু বলতে পারেন না। তিনি জানেন অমলা কত ভালোবাসে সোনুকে।

সেদিন সোনুর দাদুর বাড়ি থেকে ফোন এল। সোনুর দাদুর শরীর খারাপ। সোনুরা যেন বাড়ি আসে । সোনুর মা কথাবার্তা বলে ঠিক করলেন তিনি একাই দাদুর বাড়ি যাবেন। সোনুর স্কুলের থার্ড-টার্ম পরীক্ষা চলছে। তাই তাকে অমলামাসির হেফাজতে রেখে তিনি দাদুকে দেখতে গেলেন। সোনুদের দাদুর বাড়ি কৃষ্ণনগর। যাবার সময় বলে গেলেন, অমলা, সোনু তোমার কাছে থাকল। আমি তিন-চারদিনের মধ্যে ফিরে আসব। তুমি এ-কটা দিন সোনুর কাছে থাকো। আমি ফোনে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। অমলামাসি বললে, তুমি কোনো চিন্তা করোনি দিদি, আমি থাকতে খোকনের কোনো অসুবিধা হতে দেবনি।

প্রায় পনেরো দিন সোনুর মা আটকে পড়লেন দাদুর বাড়িতে। তাঁকে নিয়ে নার্সিংহোম-বাড়ি করতে করতে কীভাবে কেটে গেল সময়টা। এদিকে পনেরো দিন একটানা সোনুর কাছে থেকে তার পরীক্ষায় যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তা দেখল অমলামাসি। রাতে সোনুর মা ফোন করলে বলে, সব ঠিক আছে, কোনো চিন্তা করোনি তুমি।

সোনু কিন্তু বুঝতে পারে মা যাবার পরদিন থেকে অমলামাসি কেমন উদাস হয়ে থাকে মাঝে মাঝে। দু-একদিন অন্তর গ্রাম থেকে দু'একজন আসে, কীসব কথাবার্তা হয়। অমলামাসি বিকেলে সোনুর টিফিনের ব্যবস্থা করে কোথায় যেন যায়। সোনুকে বলে যায়, খোকনবাবু, তুমি একটু ঘরে থাকো, আমি দু'ঘণ্টা পরে ফিরে আসতিছি। ব্যস, সন্ধে ঠিক ছটার মধ্যে অমলামাসি ফিরে আসে। তবে সারা চোখে-মুখে কেমন একটা আতঙ্কভাব ছড়ানো থাকে। সোনু একদিন জিজ্ঞাসা করায় বললে, ও তেমন কিছু নয় গো খোকন।

সোনুর মা যেদিন ফিরে আসবেন তার আগের দিন সন্ধ্যায় অমলামাসিকে ফোন করে জানালেন, অমলা, আমি কাল যাচ্ছি। সোনুর দাদু এখন একটু ভালো আছে।

পরদিন বিকালে সোনুর মা ফিরে এলেন। ঘরে ঢুকতেই অমলামাসি কেঁদে উঠল ছেলেমানুষের মতো। বললে, দিদি, 'ও' বোধহয় বাঁচবেনি। রাস্তায় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে একটা পা বাদ গেছে। তুমি যেদিন গেলে তার পরদিন হয়েছে। আমি এখন কী করব দিদি? ও দুর্গাচক হাসপাতালে ভর্তি আছে। আমায় বাঁচাও গো দিদি। মা বললেন, এতবড় দুঃসংবাদ আমায় বলোনি কেন? অমলামাসি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, খোকনের যদি পরীক্ষার কোনো ক্ষতি হয়, তাই বলিনি গো।

ঘটনার অস্বাভাবিকতায় সোনুর মা বিহুল হয়ে পড়লেন প্রথমটায়। সোনু দেখে মায়ের চোখে জল। পরক্ষণেই তিনি

অমলামাসিকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, অমলা, এটা তুমি ঠিক করনি। তবে তুমি একদম চিন্তা করো না, আমি তো আছি। তুমি এখনই চলো হাসপাতালে। আমিও যাব। তারপর সোনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, সোনু, তুই ঘরে থাকবি। কোথাও যাবি না।

এরপর অনেকদিন চিকিৎসা চলল অমলামাসির স্বামীর। সোনুর বাবাকে সব জানানো হল। তিনি এলেন, অমলামাসির স্বামীকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করালেন। নকল পা লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

এখনও অমলামাসি সোনুদের বাড়িতে কাজ করে। তবে প্রতি সন্ধ্যায় তাকে বাড়ি যেতেই হয়। সমস্ত ব্যাপারটা শুনে, বুঝে সোনু ভাবল সত্যি অমলামাসি তাকে কত ভালোবাসে। অমলামাসির প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধার ভাব আসে তার মনে। মার কথামতো সোনু এখন সব পরীক্ষার সময় মায়ের সঙ্গে সঙ্গে অমলামাসিরও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে পরীক্ষা দিতে যায়। অমলামাসি বলে, না না, খোকন, আমার পায়ে হাত দিওনি। সোনুর মা বলেন, না অমলা, তুমি মানা করো না, তুমি ওর মায়ের থেকে কম কিসে?

ছবি ঃ সন্দীপ দেয়াসী

এ ছাড়াও যাঁদের লেখা ভালো হয়েছে ঃ

শুভম মুখোপাধ্যায় (মুখার্জি লেন, হাওড়া)।। নারায়ণ ভট্টাচার্য (অরবিন্দ নগর, বাঁকুড়া)।। মৌসুমী গোস্বামী (ভেলাইগোড়া, পুরুলিয়া)।। রাখহরি বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর, হুগলি)।। পলাশ পোড়েল (পিয়ারাপুর, হাওড়া)।। দিলীপ কুমার মিত্র (মণ্ডলপাড়া লেন, কল-৬০)।। বিশ্বদেব বটব্যাল (ভক্তাবাঁধ, বাঁকুড়া)।। জগন্ময় সাহা (চাকদহ, নদীয়া)।। কৃষ্ণা চৌধুরী (দুর্গাপুর, বর্ধমান)।। বিপ্লব পাল (বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ)।।

বিশেষ পুরস্কার

এখন তোমরা আরও পুরস্কার পাচ্ছো। আমাদের লেখক ও বৈজ্ঞানিক ডঃ ডি. চন্দ্র, তাঁর প্রয়াত পুত্র দেবাশিসের নামে স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার সেরা পাঁচজন লেখককে তাঁর লেখা বই পুরস্কার হিসেবে দেবেন।

এ মাসের পুরস্কারপ্রাপকরা ঃ সুপ্রসা রায়, সোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভম মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ ভট্টাচার্য ও মৌসুমী গোস্বামী।

ঘোষণা

বারাসত গড়ের ধার (পূর্ব), চন্দননগর, হুগলি থেকে সমর কুমার ঘোষ তাঁর প্রয়াত পিতা ঁকানাইলাল ঘোষের নামে একটি স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর প্রস্তাব মতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে কানাইলাল ঘোষ স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে মৌলিক লেখা চাইছি।

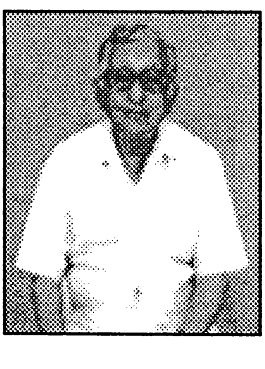

ঁকানাইলাল ঘোষ

মৃত্যু ঃ ৪ এপ্রিল ২০০৩

বিষয়বস্তু

আষাঢ়ের রাতে

*লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ আষাঢ়। পুরস্কৃত লেখাগুলি শুকতারার **অগ্রহায়ণ** সংখ্যায় ছাপা হবে।*

প্রথম পুরস্কার ঃ ১৫০ টাকা ☐ দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ ১০০ টাকা ☐ তৃতীয় পুরস্কার ঃ ৫০ টাকা

শচীন ৩২

খেলছেন ১৬ বছর ধরে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

একসময় শচীন তেন্ডুলকার আর ব্রায়ান লারাকে নিয়ে জোর তর্ক-বিতর্ক চলত। দুজনের কে সেরা তাই নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলত। এখনও যে চলে না তা নয়। দুজনেই বড় ব্যাটসম্যান। দুজনের খেলোয়াড় জীবনে খারাপ সময় এসেছে। আবার কেটেও গেছে। তবে খারাপ সময় যাচ্ছে বলে সৌরভ গাঙ্গুলিকে সমালোচনার যে ঝড় সামলাতে হচ্ছে তা বোধহয় আর কাউকে হয়নি। প্রাক্তন খেলোয়াড় থেকে আরম্ভ করে ক্রিকেট-লেখকদের একটা বড় দল সৌরভের কথা উঠলেই ছুরিতে শান দেন। এখন তো তাঁদের পোয়াবারো। তবে গাভাসকার-কপিলদেবদের মতো কয়েকজন বলেছেন, সমালোচনা নয়, সৌরভকে এখন উৎসাহ দেবার দরকার। ও বড় ব্যাটসম্যান। ও ঠিক ফিরে আসবে। সৌরভকে যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা জানেন, সৌরভ বরাবরই চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসেন। ওঁর দুঃসময়ে এই সমালোচনাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে উনি আবার ঠিকই রানের মধ্যে ফিরে আসবেন। আর সৌরভ নিজে বলেছেন, একটা ইনিংসে রান করতে পারলে আর আমায় পেছন ফিরে তাকাতে হবে না।

যাক ও সব কথা। শচীন তেন্ডুলকার এবার বত্রিশ বছরে পড়লেন। গত ১৬ বছরে অর্থাৎ তাঁর খেলোয়াড় জীবনের শুরু থেকেই শচীন তেন্ডুলকারকে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব লিটল মাস্টার হিসেবে চেনে। টেস্ট এবং একদিনের ক্রিকেটে সমান দাপটের সঙ্গে খেলে চলেছেন তিনি। ৩৪টি সেঞ্চুরি করে তিনি এখন সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করার ব্যাপারে সুনীল গাভাসকারের সঙ্গে এক আসনে বসে আছেন। আর একটি টেস্টে সেঞ্চুরি করলেই শচীন হবেন সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির মালিক। টেস্ট ক্রিকেটে মোট সবথেকে বেশি রান করার ব্যাপারে তাঁর মাথার ওপরে আছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যালান বর্ডার, স্টিভ ওয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারা। তবে একদিনের ক্রিকেটে সব থেকে বেশি রান করার ক্ষেত্রে শচীনের মাথার ওপর আর কেউ নেই। নেই সব থেকে বেশি সেঞ্চুরি করার ব্যাপারেও। একদিনের ক্রিকেট সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি তাঁরই।

শচীন তেন্ডুলকারের ১৬ বছরের খেলোয়াড় জীবনে সব থেকে বড় সমস্যা হল তাঁর কনুইকে নিয়ে—কনুই-এর ব্যথা, যন্ত্রণা, যাকে টেনিস এলবো বলে। এই জন্য গতবছর শচীন বেশ কিছুদিন খেলতে পারেননি। তবে মাঠে ফিরে এসে তিনি আবার সমান দাপটের সঙ্গে খেলছেন। কিন্তু ডাক্তাররা সিঁটিয়ে আছেন। কবে যে ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠবে কে জানে। আসলে আজকাল সারা বছর ধরে খেলোয়াড়দের এত বেশি খেলতে হয় যে তাঁদের পক্ষে বেশিদিন সম্পূর্ণ সুস্থ থাকাই মুশকিল। এ সমস্যা শুধু ভারতের নয়, গোটা ক্রিকেট বিশ্বের। বড় বেশি খেলা হচ্ছে বলে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তাও ধীরে ধীরে কমছে। টেস্ট ক্রিকেটে এখন ভাটার টান। ক্রিকেটকে বাঁচিয়ে রেখেছে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলি।

শচীন তেন্ডুলকার গত ১৬ বছরে একটির পর একটি রেকর্ড গড়ে চলেছেন। এখন তাঁর সামনে আরও রেকর্ডের হাতছানি। প্রথমে ভাঙবেন সুনীল গাভাসকারের টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করার বিশ্ব রেকর্ড। তারপর ডিঙোবেন বর্ডারদের। তাহলে টেস্ট ক্রিকেটে ব্যাটিং-এর সব থেকে বড় রেকর্ড দুটি এসে যাবে তাঁর মুঠোয়। একদিনের ক্রিকেটে তিনি তো ইতিমধ্যেই রেকর্ডের রাজা।

সম্প্রতি প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় ও নির্বাচক অশোক মালহোত্রা বলেছেন, শচীন আর এখন ভারতীয় দলের এক নম্বর ব্যাটসম্যান নয়। সে জায়গাটা ইতিমধ্যেই বীরেন্দ্র সহবাগ নিয়ে নিয়েছে। ধারাবাহিকতার দিকে দিয়ে রাহুল দ্রাবিড়ও কিন্তু খুব একটা পিছিয়ে নেই শচীনের থেকে। বরং বলা উচিত শচীনের চেয়ে রাহুলই বেশি নির্ভরশীল। এই ব্যাপারটা শচীনকে খানিকটা চাপে রাখবেই। কারণ শচীনের মতো খেলোয়াড়রা সবসময় এক নম্বরই থাকতে চায়।

সে যাই হোক এখন যা পরিস্থিতি

তাতে মনে হয় শচীন বড় জোর আর চার-পাঁচ বছর খেলতে পারবেন। তবে পরবর্তী বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা পর্যন্ত শচীন যে দাপটের সঙ্গে খেলতে পারবেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। আমরা আশা করব, সৌরভও তাঁর ফর্ম ফিরে পেয়ে ওঁদের পাশে থাকবেন। কারণ সৌরভের মতো দক্ষ দলনেতা এই মুহূর্তে বিশ্ব ক্রিকেটে খুব কমই আছেন। সৌরভ-বিদ্বেষীদের কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে ইনজামাম-উল-হকের তুলনা করছেন। তাঁরা তা করছেন এবারের সিরিজের পরিপ্রেক্ষিতে। এই ব্যাপারে ইনজামাম কিন্তু অন্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, সৌরভ ফর্মে না থাকায় তাঁর পক্ষে দল পরিচালনা করা এবং পাকিস্তানকে টেস্ট সিরিজ সমান সমান করা ও একদিনের ক্রিকেটে দলকে জয়ের পথে টেনে নিয়ে যাওয়া সহজ হয়েছিল। সৌরভ ফর্মে থাকলে ব্যাপারটা অনেক কঠিন হয়ে যেত। শেষ দুটি একদিনের ম্যাচে ও তো দলেই ছিল না। সেই সুযোগটা আমরা পুরোপুরি নিয়েছি। ও খেললে ব্যাপারটা অত সহজ হবে বলে আমার মনে হয় না।

এবার পরিসংখ্যানের ওপর একটু নজর বোলানো যাকঃ

টেস্ট ক্রিকেটে তেন্ডুলকার (প্রত্যেক ২৫ টেস্টের পর)

টেস্ট	রান	সর্বোচ্চ	গড়	সেঞ্চুরি	হাফ সেঃ
২৫	১,৫২২	১৬৫	৪৪.৭৬	৫	৮
৫০	৩,৪৩৮	১৭৯	৪৯.৮৩	১১	১৬
৭৫	৫,৯৯৫	২১৭	৫৬.০৩	২২	২৪
১০০	৮,৪০৫	২১৭	৫৭.৯৭	৩০	৩৪
মোট ১২৩	১০,১৩৪	২৪৮*	৫৭.২৫	৩৪	৪১

টেস্ট ক্রিকেটে সব থেকে বেশি রান

	টেস্ট	রান	সর্বোচ্চ	গড়	সেঞ্চুরি	হাফ সেঃ
অ্যালান বর্ডার (অস্ট্রে)	১৫৬	১১,১৭৪	২০৫	৫০.৫৬	২৭	৬৩
স্টিভ ওয়া (অস্ট্রে)	১৬৮	১০,৯২৭	২০০	৫১.০৬	৩২	৫০
ব্রায়ান লারা (ওঃ ইন্ডিজ)	১১৪	১০,৪৭০	৪০০*	৫৩.৯৭	২৮	৪৬
শচীন তেন্ডুলকার (ভারত)	১২৩	১০,১৩৪	২৪৮*	৫৭.২৫	৩৪	৪১
সুনীল গাভাসকার (ভারত)	১২৫	১০,১২২	২৩৬*	৫১.১২	৩৪	৪৫

একদিনের ক্রিকেটে তেন্ডুলকার (প্রত্যেক ৫০ ম্যাচের পর)

টেস্ট	রান	সর্বোচ্চ	গড়	সেঞ্চুরি	হাফ সেঃ
৫০	১,৪৪৬	৮৪	৩৩.৬৩	-	১২
১০০	৩,১৪৬	১১৫	৩৬.৫৮	৪	২১
১৫০	৫,৩২১	১৩৭	৪০.০১	১২	৩২
২০০	৭,৩০৫	১৪৩	৪১.৭৪	১৮	৪৩
২৫০	৯,২৮৭	১৮৬*	৪২.০২	২৫	৪৭
৩০০	১১,৫৪৪	১৮৬*	৪৪.২৩	৩৩	৫৬
মোট ৩৪৮	১৩,৬৪২	১৮৬*	৪৪.৪৪	৩৮	৬৯

একদিনের ক্রিকেটে সব থেকে বেশি রান

	ম্যাচ	রান	সর্বোচ্চ	গড়	সেঞ্চুরি	হাফ সেঃ
শচীন তেন্ডুলকার	৩৪৮	১৩,৬৪২	১৮৬*	৪৪.৪৪	৩৮	৬৯
ইনজামাম-উল-হক	৩৪২	১০,৮৫৯	১৩৭*	৩৯.৯২	১০	৮০
সৌরভ গাঙ্গুলি	২৭০	৯,৯৪৫	১৮৩	৪১.২৭	২২	৫৯

***অপরাজিত**
(পরিসংখ্যান ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত)

উক্তি

আমি যদি ম্যাচ রেফারি হতাম তাহলে আই সি সি-র নিয়ম অনুযায়ী সৌরভকে সাসপেন্ড করতে বাধ্য হতাম। চারটে ম্যাচ সাসপেন্ড করতাম। তার বেশি নয়। ছ'ম্যাচে সাসপেনশান বড্ড বেশি হয়ে গেছে।

গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ

(কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে এসে কথা প্রসঙ্গে)

সব ম্যাচেই জিততে হবে—এ কখনও হয় নাকি! তবে খেলোয়াড়রা সে চেষ্টা তো করবেই। কিন্তু সবসময় পেরে ওঠে না। তখন ভেঙে পড়ে—যা তাদের খেলার ওপর প্রভাব ফেলবেই।

সুভাষ ভৌমিক

(সালগাঁওকারের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হবার পর)

ওয়ানে রুনি ইংলন্ডের স্কুল ফুটবলারদের কাছে কিছুতেই 'রোল মডেল' হতে পারে না। আমরা রুনির বদলে একজনকে খুঁজে বের করছি। ওকে আদর্শ করে ছাত্ররা বড় হোক এ আমরা চাই না। রুনির বয়স ১৯। মাসে তার রোজগার ৫০,০০০ পাউন্ড। সব ঠিক আছে, কিন্তু তার জীবনযাত্রা যেরকম তাতে সে ছোটদের আদর্শ হতে পারে না।

ইংলন্ডের স্কুল ফুটবলের জনৈক মুখপাত্র

(রুনির বদলে আর একজনকে ছোটদের রোল মডেল করার প্রসঙ্গে)

হ্যাঁ, আমিও ভারতের অধিনায়ক হতে চাই। তবে এখনই নয়। এখনও আমাকে আরও অনেক কিছু শিখতে হবে। এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য নিজের খেলাটা ধরে রাখা।

বীরেন্দ্র সহবাগ

(এক সাক্ষাৎকারে)

সত্যিকারের দক্ষ দলনেতা বলতে যা বোঝায় সৌরভ গাঙ্গুলি ঠিক তাই। আমার মতে তিনিই বর্তমান বিশ্বের এক নম্বর বা সেরা অধিনায়ক।

হরভজন সিং

(সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে)

সৌরভ ফর্মে নেই তো কী হয়েছে, আজ নেই তো কাল থাকবে। বড় বেশি সমালোচনা হচ্ছে ওর অফ ফর্ম নিয়ে। ভালো না হয়ে এতে ওর ক্ষতিই হচ্ছে। শুধু সৌরভেরই নয়, ক্ষতি হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটেরও।

অনিল কুম্বলে

(একটি সাক্ষাৎকারে)

রক্ষণাত্মক না আক্রমণাত্মক খেলব তা নির্ভর করছে মাঠের পরিবেশ, পরিস্থিতি আর প্রতিদ্বন্দ্বী দলের শক্তি বিচার করে। খেলার স্ট্র্যাটেজি মাঠেই তৈরি হয়। আগে থাকতে বলেকয়ে এসব করা যায় নাকি?

অমল দত্ত

(খেলার স্ট্র্যাটেজি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে)

পথের রাজা ছোটার মজা

অ্যাটলাস সাইকেলের নতুন বাইক

সোনেপাত

ক্ষুদে সওয়ারীদের (৮-১০ বছর) জন্য এসে গেল এবার সেরা সাইকেল সোনেপাত। স্টাউট, স্ট্রিংগারের পর অ্যাটলাস সাইকেলের এই কিড মডেল এক্কেবারে লা-জবাব। যেমন ঝকঝকে রংদার চেহারা, তেমনি নিখুঁত কারিগরি। ছুটবে যেন পক্ষিরাজ। আর কী চাই!

সোনেপাত-এর যাত্রা শুরু উপলক্ষে কলকাতায় এসে অ্যাটলাস সাইকেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ অঙ্গদ কুমার বলেন যে, পশ্চিম বাংলার বাজারে সোনেপাত কদর পাবেই। কারণ স্মার্ট বাচ্চাদের জন্য সোনেপাত-এ রয়েছে বাড়তি নানা আকর্ষণ।

সোনেপাত মানেই আরও বেশি মজবুত। আরও বেশি শক্তি।

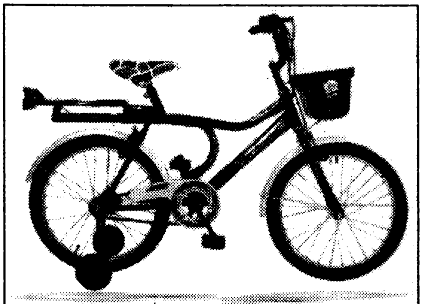
অ্যাটলাস কলম্বাস

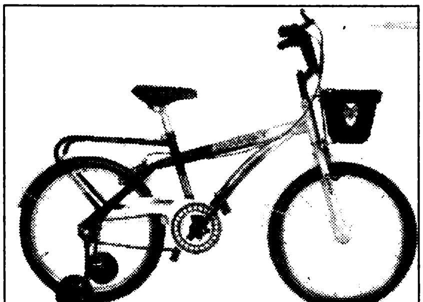
অ্যাটলাস ফ্রেঞ্জি

অ্যাটলাস র-পেট

সমস্যায় ইরফান পাঠানও

সৌরভ গাঙ্গুলির সমস্যা তাঁর ফর্ম। আর ইরফানের চোট-আঘাত। ইরফানের বয়েস মাত্র ২০। এরই মধ্যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তাঁর ফিটনেস নিয়ে। গরিব ঘরের ছেলে ক্রিকেটের দৌলতে মাত্র দু' বছরের মধ্যে এখন রীতিমতো অবস্থাপন্ন। কিন্তু তিনি যদি সবল, সুস্থ থেকে খেলা চালিয়ে যেতে না পারেন তাহলেই মুশকিল। আসলে আজকাল খেললেই লক্ষ লক্ষ টাকা। তার ওপর শিরোনামে থাকা। কে আর এই সুযোগ ছাড়তে চায়! তাই পুরো সুস্থ না হয়েই ফিট সার্টিফিকেট দিয়ে মাঠে নেমে পড়ার ধান্দা। ব্যাটসম্যানরা তবু পার পেয়ে যান। ঝামেলায় পড়েন বোলাররা। বিশেষ করে তিনি যদি পেস বোলার হন তাহলে তো আর কথাই নেই। সেই পরিস্থিতির সাম্প্রতিকতম শিকার হলেন ইরফান পাঠান। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলার সময় নির্বাচকরা শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন তাঁকে দল থেকে বাদ দিতে। অথচ কয়েকমাস আগেও সে কথা কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না। কারণ জাহির খান আর ইরফান পাঠান ভারতীয় পেস বোলিং-এ নতুন মাত্রা এনে দিয়েছেন। জাভাগল শ্রীনাথের অভাব এঁরা বুঝতেই দেননি। কিন্তু জাহির আর ইরফান এখন চোট-আঘাতে বড্ড ভুগছেন।

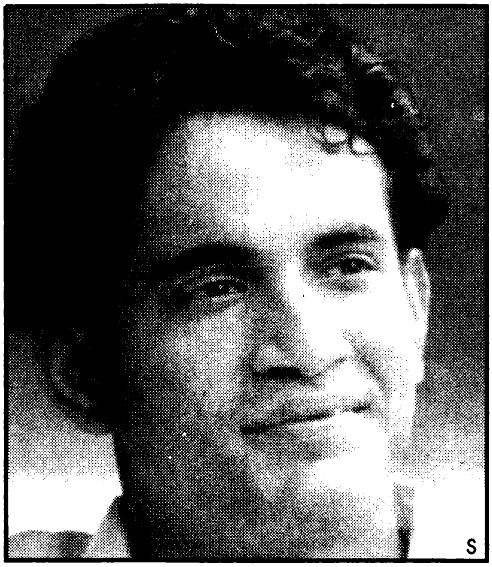

গত বছরটা ইরফান পাঠানের কাছে ছিল অনেকটা স্বপ্নের মতো। আচমকা ডাক পেলেন অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে যাবার। সেখানে কয়েকটা স্বপ্নের বল করে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন ভারত ওয়াসিম আক্রামের মতো একজন পেস বোলারকে পেতে চলেছে। আর পাকিস্তানে খেলতে গিয়ে তিনি সকলকে বুঝিয়ে দিলেন ইরফান পাঠানের যুগ শুরু হয়েছে।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলা চলার মাঝামাঝি সময়ে প্রথমে তাঁর পায়ের মাংসপেশীতে টান ধরল। ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। পেস বোলারদের এমনটা হয়েই থাকে। ও নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায়নি। তারপর বাংলাদেশে খেলতে গিয়ে দুটি টেস্টে ১৮টি উইকেট দখল করে ইরফান নিজে যেমন খুশি হয়েছিলেন তেমনি ফেলেছিলেন স্বস্তির নিঃশ্বাস। কিন্তু বাংলাদেশে খেলতে গিয়ে ইরফানের কুঁচকির ব্যথা প্রথম শুরু হল। ব্যাপারটা তেমন কিছু মারাত্মক নয়। তবে প্রত্যাশিত থেকে অনেক বেশি সময় লেগে গেল ইরফানকে পুরোপুরি সুস্থ করে তুলতে। ইরফান নিজেই বলেছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম টেস্ট শুরু হবার মাত্র ২০ দিন আগে তিনি ফিট সার্টিফিকেট পাবার মতো হন।

একজন নির্বাচক দল গড়ার আগেই ইরফানের সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেই কথাই বরোদা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে বাধ্য করল ২টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ-এর আয়োজন করতে। সেই দুটি খেলাতেই ইরফান পাঠান খেললেন। উইকেটও পেলেন। ফলে মোহালিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট দলে এসে গেলেন পাঠান। কিন্তু আশানুরূপ বল করতে পারলেন না। পারলেন না ছন্দে ফিরতে। ভাবলেন, বাঙ্গালোর টেস্টের আগেই ছন্দে ফিরতে পারবেন। কিন্তু পারলেন না। একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচেও প্রত্যাশামতো বল করতে পারলেন না। ফলে তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হল। ইরফান পাঠান এখন নিজেকে তৈরি করে নিতে ব্যস্ত। ইংলন্ডে কাউন্টি ক্রিকেটে খেলতে যাবার কথা ছিল, তাও যাবেন না। ইংলন্ডের বদলে যাবেন এম আর এফ পেস অ্যাকাডেমিতে। কারণ সকলেই চান, ইরফান পাঠান ভালো হয়ে উঠে আবার ভারতীয় আক্রমণের হাল ধরুন।

পরিসংখ্যানে ইরফন পাঠান

চোট লাগবার আগে

	টেস্ট	ইং	নঃ আঃ	রান	সর্বোচ্চ	গড়	১০০	৫০	ক্যাচ
	৭	৮	১	১৭৮	৫৫	২৫.৪২	-	১	২
বোলিং	ওভার	মেডেন	রান	উইঃ	সেরা	গড়	৫ উইঃ	১০ উইঃ	
	২৫৯	৬৫	৭৭৬	১৮	৪/১০০	৪৩.১১	০	০	

চোট লাগবার পরে

	টেস্ট	ইং	নঃ আঃ	রান	সর্বোচ্চ	গড়	১০০	৫০	ক্যাচ
	৬	৮	১	৯৭	৩৮*	১৩.৮৫	০	০	৩
বোলিং	ওভার	মেডেন	রান	উইঃ	সেরা	গড়	৫ উইঃ	১০ উইঃ	
	২১৮	৫০	৭১৩	২৭	৬/৫১	২৬.৪০	৩	১	

এর মধ্যে অবশ্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট ম্যাচ আছে। ঐ দুটি টেস্টে ইরফান পাঠান ১৮টি উইকেট দখল করেছিলেন। সে যাই হোক মাত্র ২০ বছর যার বয়স সে কেন কেরিয়ারের শুরুতেই চোট-আঘাত নিয়ে এত বিব্রত হবে? কপিলদেব তো দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বোলিং-এর হাল ধরেছিলেন। কই তাঁকে তো চোট-আঘাত নিয়ে কখনও বিব্রত হতে দেখা যায়নি!

আমরা আশা করব এম আর এফ পেস অ্যাকাদেমিতে গিয়ে ইরফান পাঠান আবার নিজেকে ফিরে পাবেন এবং ভারতের আক্রমণের হাল ধরবেন।

এক নজরে

দাবায় অস্কার

গত বছরের মতো এ বছরও দাবায় অস্কার জিতেছেন ভারতের বিশ্বনাথন আনন্দ। শুধু তাই নয়, এবার নিয়ে তিনি চারবার এই খেতাব জিতলেন। গ্যারি কাসপারভ ছাড়া এই কৃতিত্ব আর কেউ দেখাতে পারেননি। আনন্দর বয়স এখন ৩৫।

এই মুহূর্তের রেটিং-এ তিনি আছেন সবার ওপরে। তাঁর পয়েন্ট ৫,০২৬। দ্বিতীয় স্থানে আছেন প্রতিযোগিতামূলক দাবার আসর থেকে সদ্য অবসর নেওয়া দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভ। তাঁর সংগ্রহে ৩,৬৬৪ পয়েন্ট।

পঞ্চাশ বছর পরে

দীর্ঘ ৫০ বছর অপেক্ষা করার পর চেলসি এবার ইংলিশ লীগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। বোল্টন ওয়ান্ডার্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে চেলসি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। চেলসি এর আগে মাত্র আর একবারই এই লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব জিতেছিল।

ওদিকে বেয়ার্ন মিউনিখ জার্মান ফুটবল চ্যাম্পিয়ানশিপ-এ শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছে। ১১ বছরের এই প্রতিযোগিতায় বেয়ার্ন এবার নিয়ে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হল।

আবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

ইংলন্ড অ্যামেচার বিলিয়ার্ডস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত মহিলাদের বিশ্ব বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়িনীর খেতাব জিতেছেন ভারতের অনুজা ঠাকুর। স্কটল্যান্ডের লিনেট হর্সবার্গকে ২৪৩-১৩৬ পয়েন্টে হারিয়ে অনুজা এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। অনুজা গত তিন বছর ধরে ভারতের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। অনুজার ঠিক আগে পঙ্কজ আদবানী বিলিয়ার্ড খেলায় বিশ্ববিজয় করেছিলেন।

শচীন নেই

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলনের র‍্যাঙ্কিং-এ সবার ওপরে এখন দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যাক কালিস। তাঁর সংগ্রহ ৮৮৬ পয়েন্ট। তাঁর পরেই আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারা। লারার পয়েন্ট ৮৭৫। তিন নম্বরে ভারতের রাহুল দ্রাবিড় আর পাঁচে বীরেন্দ্র সহবাগ। দশজনের এই তালিকায় জায়গা হয়নি ভারতের শচীন তেন্ডুলকারের। তিনি আছেন বারো নম্বরে। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে প্রথম দশজনের মধ্যে আছেন শুধু অনিল কুম্বলে। ৮৯৭ পয়েন্ট পেয়ে এক নম্বর স্থানে আছেন অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাকগ্রা। দ্বিতীয় স্থানে শ্রীলঙ্কার মুথাইয়া মুরলিধরন। তাঁর সংগ্রহ ৮৩৪ পয়েন্ট।

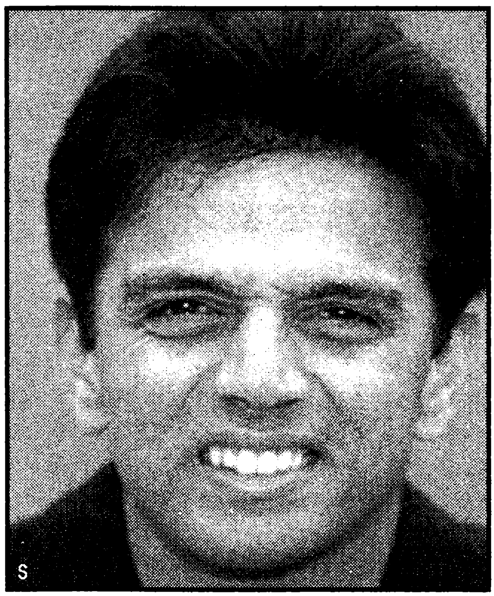

উঠছে যারা

বীরু বসু

বয়স অনুপাতে ওর উচ্চতা অনেক বেশি। যেটা মিনি ভলিবলে মানানসই নয়, কিন্তু অল্প বয়সে বেড়ে উঠলে কিছুই করার থাকে না, অথচ সেই কারণেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে লোকের চোখে পড়ে। ঠিক এই ভাবেই চোখে পড়েছিল শ্রীরামপুর কালীতলা অঞ্চলের মেয়ে মৌমিতা দাস, এবারের রাজ্য মিনি ভলিবলে। প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল ভদ্রেশ্বর ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাব মাঠে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা অংশ নিয়েছিল এই প্রতিযোগিতায়। মৌমিতা অংশ নিয়েছিল তার জেলা হুগলির হয়ে। রাজ্য মিনিতে মৌমিতার ছিল এটা দ্বিতীয় বছর।

প্রথম বছর হুগলি চ্যাম্পিয়ন হলেও মৌমিতার খেলা তখন তেমন ভাবে নজর কাড়তে পারেনি। বছর ঘুরতেই মৌমিতা আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তরতর করে বাড়তে থাকে তার উচ্চতা। নজর কাড়ে কর্মকর্তাদের। কর্মকর্তারাই এবারের প্রতিযোগিতায় অধিনায়িকার দায়িত্ব দিয়েছিলেন মৌমিতাকে। অধিনায়িকা হিসেবে মৌমিতা সফল, তার অধিনায়কত্বেই হুগলি জেলা পরপর দু'বছর চ্যাম্পিয়ন হল। শুধু জেলাকে চ্যাম্পিয়ন করেই থেমে থাকেনি মৌমিতা, রীতিমতো টুর্নামেন্টের সেরা ব্যক্তিগত খেলোয়াড়ের সম্মানটিও তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন উদ্যোক্তারা। এর পরেই মৌমিতার উচ্চতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিজিত উত্তর চব্বিশ পরগনার কর্মকর্তারা, কিন্তু মৌমিতা যে বয়স ভাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়নি তা প্রমাণ করে দেন উদ্যোক্তারা।

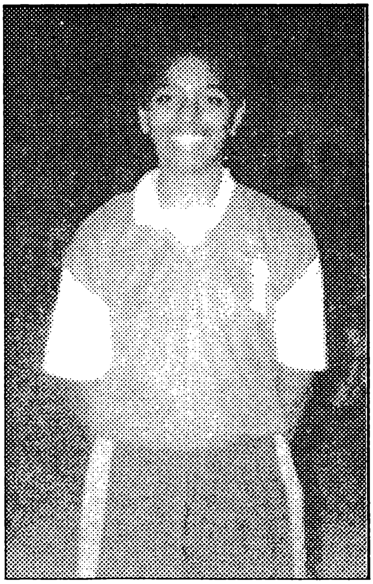

মৌমিতা দাস

মৌমিতার বয়স প্রমাণ করেছে মৌমিতার স্কুল চাঁতরা নন্দলাল ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস। ঐ স্কুলেরই ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী মৌমিতার বয়স স্কুল রেকর্ডসে বারো। লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভালো, উচ্চতার মর্যাদা দিয়ে বেছে নিয়েছে ভলিবল খেলাটাকে। আর এক্ষেত্রে মৌমিতা যে ভুল করেনি তা এতদিনে বুঝে গেছেন তার কোচ অশোক ভট্টাচার্য।

মেয়ে সাফল্য পাওয়ায় বাবা-মা উভয়েই খুশি। বাবা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চন্দননগর শাখায় কাজ করেন। সারাদিন ব্যস্ত থাকায় মৌমিতার দায়িত্ব বর্তায় মা মিনতি দাস-এর ওপর, মার অনুপ্রেরণাতেই ভলিবলে উঠে আসতে পেরেছে মৌমিতা। এ ছাড়াও মৌমিতা সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছে তার স্কুল থেকে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা চাপু চ্যাটার্জি এবং ক্রীড়া-শিক্ষিকা কবিতা দাস পাশে না থাকলে শ্রীরামপুর সবুজ সাথী ক্লাব পর্যন্ত পৌঁছতে পারত কিনা সন্দেহ। গত আট বছরে এই ক্লাব থেকেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশ নিয়েছে মৌমিতা। বিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠ থাকায় ফিজিক্যাল ফিটনেসেও অনেক এগিয়ে রয়েছে মৌমিতা। একদিকে স্ম্যাশিং অপর দিকে ব্লকিং-এ অস্বাভাবিক ভাবে উন্নতি করেছে মৌমিতা। এখন শুধু জেলা নয়, সবুজ সাথীর হয়ে চার বছর যাবৎ রাজ্য ভলিবল লিগেও অংশ নিচ্ছে মৌমিতা। সদাহাস্যময়ী এই মেয়েটি বরাবরই সৌরভ গাঙ্গুলির ভক্ত, ফুটবলে ব্রাজিল-এর সমর্থক। এছাড়া বাঁটুল দি গ্রেট এবং হাঁদা-ভোঁদার কমিক্স পড়তেও ভালোবাসে। তবে এই মুহূর্তে মৌমিতার লক্ষ্য একটাই, জাতীয় ভলিবলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা।

● জনশ্রুতি

রাজর্ষি

মহসীন মল্লিক

ছেলেবেলায় রাজকুমারকে তার কাকা বন্দীশালায় কয়েদ করে রাখলেন। কাকা চান তাঁর সিংহাসন নিরাপদ হোক। বন্দীশালায় বসে বালকটি পবিত্র কোরান নকল করে। হাতে লেখা সেই কোরান বিক্রির অর্থে সে নিজের খরচ চালাত। সরকারি দাক্ষিণ্যের দান সে গ্রহণ করেনি।

পরবর্তীকালে বাদশাহ হয়েও তিনি কোরান নকল করেই সংসার চালাতেন। রাজকোষের অর্থ নিজের কাজে ব্যবহার করতেন না। একদিন তাঁর বেগম রান্না করতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেললেন। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি বাদশাহকে একজন রান্নার লোক রাখতে অনুরোধ করলেন। বাদশাহ বললেন, আমার অতো টাকা কোথায়? আমার কাছে যা আছে তা তো প্রজাদের গচ্ছিত আমানত। তা থেকে আমি তো খরচ করতে পারি না।

কে এই রাজর্ষি, যিনি রাজা হয়েও ঋষির মতো জীবনযাপন করতেন? ইনি হলেন বিখ্যাত প্রজাবৎসল সম্রাট নাসিরুদ্দিন। রাজত্বকাল ১২৪৬—৬৬ খ্রিস্টাব্দ।

ভয়ঙ্কর সেই রাত

পারমিতা সিনহা

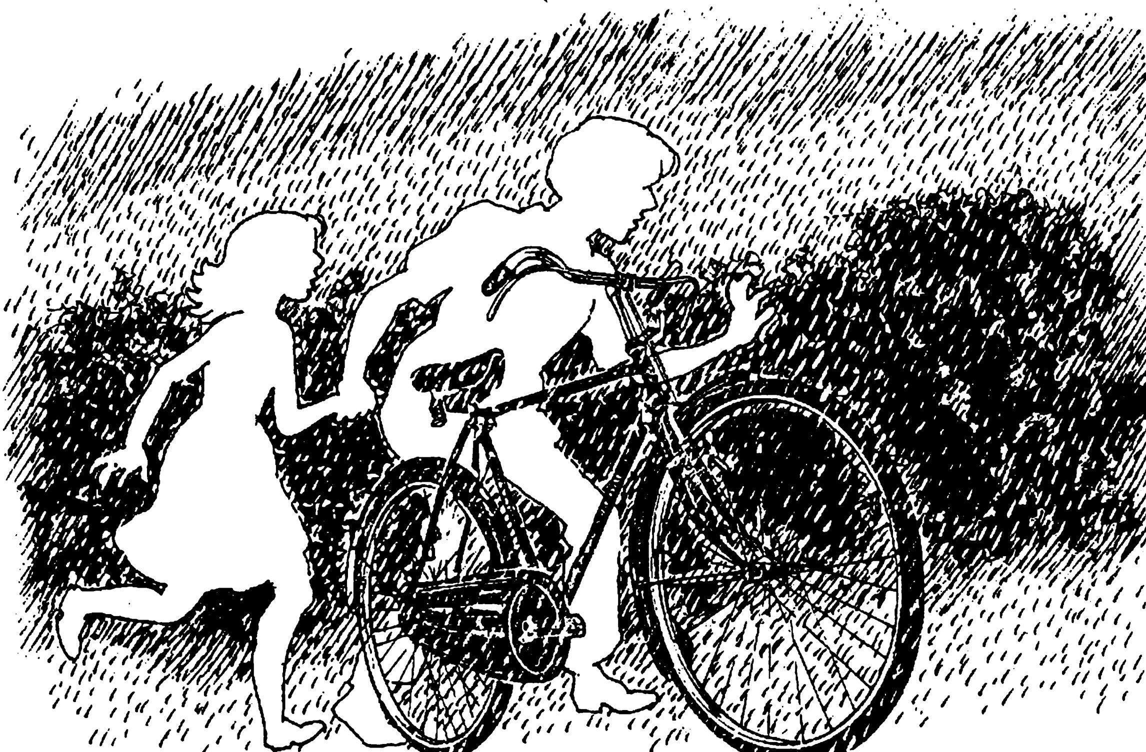

মানুষের জীবনে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে যা কোনোদিনই ভুলতে পারা যায় না এবং সেই ঘটনাকে বুদ্ধি দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায় না। এই রকম একটা ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছিল, যা আজও আমি ভুলতে পারিনি।

আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগের ঘটনা, তখন আমি ক্লাস এইটের ছাত্রী। একদিন হঠাৎ ছোটমামা গ্রামের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি এসে হাজির। মাকে বলল, 'দিদি, আমাদের পাশের গ্রামে এবারে যাত্রা হবে। ঝুমু তো কোনো দিন যাত্রা দেখেনি, তাই মা ওকে নিয়ে যেতে আমাকে পাঠিয়েছে।' মা প্রথমে আপত্তি করলেও পরে আমাকে মামার সঙ্গে যেতে দিল।

আমার মামাবাড়িটা একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ে। গ্রামের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে মাটির রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে গাছপালা, ছোট ছোট পুকুর। স্থানে স্থানে ঝোপ-ঝাড় আর আগাছার জঙ্গল। বাড়ি-ঘরগুলো একটা থেকে আর একটা এতো দূরে যে একটা বাড়ি থেকে দশজন মিলে চিৎকার করে ডাকলেও আর একটা বাড়ির লোক শুনতে পাবে না।

মামাবাড়ি গিয়ে প্রথমদিনটা চারদিক দেখতে শুনতেই কেটে গেল। পরের দিন যাত্রা হবে। রাত্তিরে স্বপ্ন দেখলাম। রাম সীতাকে খুঁজছে আর রাবণ রামের অবস্থা দেখে হাহা করে হাসছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে বেজে চলেছে যাত্রাপার্টির নানা ধরনের বাজনা। যাত্রাটা বেশ উপভোগ করছিলাম, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি দিদু ডাকছে— সকাল হয়ে গেছে।

সন্ধের সময় খেয়ে-দেয়ে মামা আর আমি সাইকেলে চড়ে পাশের গ্রামে রওনা হলাম। যাত্রা শুরু হবে রাত্রি আটটায়। আমরা ঠিক সময়েই পৌঁছে যাব। রাস্তায় জমাট অন্ধকার।

আমি আর মামা অন্ধকারে নির্জন রাস্তায় সাইকেলে চড়ে সাবধানে এগিয়ে চলেছি। চতুর্দিকে কেমন যেন অস্বাভাবিক থমথমে ভাব। রাস্তার দু'ধারের গাছগুলো ঠিক যেন দৈত্যের মতো আমাদেরকে গিলতে আসছে। মামার কাছে যে টর্চ আছে তার আলোতে অন্ধকারটাকে যেন আরো অন্ধকার লাগছে। আশ্চর্য, এতক্ষণ আমরা রাস্তা দিয়ে আসছি কিন্তু মানুষ তো দূরে থাক কোনো জীবজন্তুও আমাদের চোখে পড়ল না। মামা একবার আমাকে জিগ্যেস করল, 'কিরে ভয় পাচ্ছিস?' আমি মনে মনে একটু ভয় পেয়েছি কিন্তু মামা যদি আমাকে ভীতু ভাবে তাই বললাম, 'না, ভয় পাইনি।' মামা বলল, 'জানিস ঝুমু, মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে।' মামার কথাটা শেষ হতে না হতেই প্রচণ্ড জোরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হল আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এল ঝড়। ঝড়ের ঝাপটায় নিমেষের মধ্যে যেন সবকিছু ওলটপালট হয়ে যেতে লাগল। মাঝেমাঝেই বাজ পড়ার কড়কড়ানি শব্দ কানে এসে লাগছে

নতুন বই
সুবোধ ঘোষ উপন্যাস সমগ্র
(তৃতীয় খণ্ড) ২০০.০০
শ্রেষ্ঠ গল্পে নটরাজন
(২০টি গল্পের সংকলন) ২৫০.০০
সুভাষ ধরের
পুলিশ ফাইল থেকে ৪৫.০০
জাহান আরা সিদ্দিকীর
ষড়চক্র
নির্বাচিত রহস্য গল্প ৬০.০০
শেষ সংলাপ ৫৫.০০
ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবীর
শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রমুখে ১২৫.০০
(ষষ্ঠ খণ্ড)
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নট আউট ২৫.০০
বনফুল উপন্যাস সমগ্র
১ম খণ্ড— ২৭৫.০০
২য় ও ৩য় খণ্ড—৩০০.০০
৪র্থ খণ্ড—৩২৫.০০
ছোট-বড় সকলের জন্য
রবিদাস সাহারায় সম্পাদিত
শতাব্দীর সেরা ভূতের গল্প
শতাব্দীর সেরা রূপকথা
শতাব্দীর সেরা গোয়েন্দা গল্প
শতাব্দীর সেরা কল্পবিজ্ঞান
প্রতিটি ১০০ টাকা
পাঁচরসিকের পাঁচালি ৭০.০০
অরূপরতন ভট্টাচার্য সম্পাদিত
বিজ্ঞান যখন ভাবায় ২৬৫.০০
অরূপরতন ভট্টাচার্য ও ডাঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
স্বাস্থ্য যখন ভাবায় ১০০.০০
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
ফোন-২২৪১ ২২৪৩

আর তার সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলকানি। মনে হচ্ছে যেন দক্ষযজ্ঞ লেগে গেছে। আমরা রাস্তার মাঝখানে মহা বিপদে পড়লাম। আমাদের সাইকেলটা উল্টে যাবার মতো অবস্থা। মামা বলল, 'নাহ্, সাইকেলে চেপে আর যাওয়া যাবে না। পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে।' এই কথা বলে মামা সাইকেলটাকে রাস্তার মধ্যে রেখে আমার হাত ধরে দৌড়াতে শুরু করল। আমিও মামার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে লাগলাম।

সামনে শুধু অন্ধকার। যতই দৌড়াচ্ছি ততই যেন কোনো এক অজানা অন্ধকার জগতে পৌঁছে যাচ্ছি। আলো বলতে মামার হাতের টর্চটা। কিন্তু তার আলো যেন অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে একটি আলোর ছোট্ট ঢেউ। আমরা দু'জনেই সম্পূর্ণ ভিজে গেছি। এইভাবে অনেকক্ষণ চলার পর হঠাৎ কি একটা জিনিসে হোঁচট খেয়ে দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। মামার হাতের টর্চটা ছিটকে গিয়ে রাস্তার ধারে একটা পুকুরের মধ্যে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত জায়গাটা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে গেল। তারই মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে আমরা যে জিনিসটা পেলাম তা হল আমাদের সাইকেল।

আমি চমকে উঠলাম! আমাদের সাইকেলটা তো আমরা রাস্তায় ফেলে এসেছি। সেটা এখানে এল কি করে? মামা বলল, 'মনে হয় আমরা ভুল পথে এসেছি, তাই একই রাস্তায় আবার এসে গেছি।' কথাটা বলার সময় মামার গলাটা একটু কেঁপে গেল। এক অজানা আতঙ্ক মুহূর্তের মধ্যে আমাদের ঘিরে ফেলল। তবুও সাহসে ভর করে আমরা আবার দৌড়াতে শুরু করলাম। আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত ক্রমাগত হয়েই চলেছে। সমস্ত পৃথিবীটা বুঝি এবার ধ্বংস হয়ে যাবে। রাস্তা পিছল হয়ে পড়েছে। দৌড়াতে অনেক অসুবিধা, তবুও আমরা না থেমে দৌড়িয়ে চলেছি। কিছুক্ষণে চলার পর আবার আমরা কি একটা জিনিসে ধাক্কা খেয়ে সামনের দিকে ছিটকে পড়লাম। বিদ্যুতের ঝলকানিতে দেখি জিনিসটা হল সেই সাইকেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে কী ভীষণ শব্দে সামনেই কোথাও বাজ পড়ল আর তার সঙ্গে সঙ্গে এক বিকট অট্টহাসির শব্দ। আমি তো ভীষণ ভয় পেয়ে আঁতকে উঠলাম। কিন্তু মামা হঠাৎ সাহস করে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ভয় পাস না ঝুমু। সব সময় মনে রাখবি মানুষ কখনও বিদেহী আত্মার কাছে হারতে পারে না আর হারেও না। আমরা আর থামবো না।' এই বলে মামা আমার হাত ধরে আবার দৌড়াতে শুরু করল। আমরা যতই দৌড়াই ততই ঐ বিকট অট্টহাসি আমাদের পিছন পিছন আসতে থাকে।

এইভাবে প্রায় দু'ঘণ্টা পাগলের মতো আমরা দৌড়েছি, কোথাও থামিনি। শেষ পর্যন্ত যখন আমরা প্রায় আধমরা অবস্থায় তখন দূরে একটি আলো আমাদের চোখে পড়ল। মামা আমাকে আলোর উৎসর দিকে নিয়ে গেল। কিছুদূর এগিয়ে কাছাকাছি গিয়ে দেখি আলোটা একটা ছোট চায়ের দোকান থেকে আসছে। সেখানে পাঁচজন লোক বসে চা খাচ্ছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে এবং আমাদের অবস্থা দেখে তারা প্রথমে চমকে উঠল, তারপর তাড়াতাড়ি আমাদের বসতে দিয়ে মামাকে গরম চা এবং আমাকে গরম দুধ খেতে দিল।

আমি আর মামা যখন একটু সুস্থ ও স্বাভাবিক হলাম তখন একজন জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছিল বলুন তো? আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে আপনারা কোনো ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছিলেন।' মামা যখন সব কথা খুলে বলল তখন সেই লোকটি আতঙ্কিত গলায় বলল, 'মশাই, আপনারা দুজনে খুব জোর বেঁচে গেছেন। দু'বছর আগে একজন সাইকেল আরোহী এই রকম জল-ঝড়ের রাতে ঐ রাস্তা দিয়ে যাবার সময় বাজ পড়ে মারা যায়। তারপর থেকে বৃষ্টির সময় যে ঐ রাস্তা দিয়ে যায় তাকেই সে মেরে ফেলে। এই জন্যে ঐ রাস্তা দিয়ে কেউ আর যাওয়া-আসা করে না। রাস্তাটা পরিত্যক্ত। আপনারা ভুল রাস্তা দিয়ে এসেছেন।'

আমরা দুজনে অবাক হয়ে লোকটির কথাগুলো শুনলাম। অনিবার্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার স্বস্তি এবং ঘটে যাওয়া ঘটনার আতঙ্কের রেশ মিলেমিশে আমাদের হতবাক করে দিয়েছে। মামা ও আমি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নির্বাক বসে থাকলাম।

ছবি ঃ দিলীপ দাস

মনের জানলা

জগদিন্দ্র মণ্ডল

[অধ্যাপক ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন ডিন (বিজ্ঞান) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

প্রশ্ন ঃ আমি বি. এ. প্রথম বর্ষের ছাত্র। ছোটবেলা থেকেই দেখছি মা-বাবার মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া। অবশেষে আমার বয়স যখন আট বছর, তখন মা divorce-এর মামলা করল। পরে একদিন মা আমাকে বলল, তোর এখন বাবা-মা দুই-ই আমি। বাবাকে মাসে একদিন আমাদের বাড়িতে আমাকে দেখতে আসতে দেখতাম। এখন আমি বড় হয়েছি। মার আদর-যত্নের ত্রুটি না থাকলেও, বাবার থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করার ঘটনা মেনে নিতে পারছি না। কেবলই মনে হয় মা-বাবা একটু adjust করলে আমার এই বঞ্চিত অবস্থা হয় না। দয়া করে বলে দিন, কী করব?

—সৌম্য, মধ্য দুর্গাপুর, কলকাতা-৬৫

উত্তর ঃ সৌম্য, জীবনে সত্য অনেকসময় নিষ্ঠুর হয়ে আসে এবং এই নির্মম সত্যকে মেনে নিতে হয়। ভেবে দেখো, তাদের কথা, যারা অনাথ, বাবা-মা কোথায় জানে না। জানে না বাবা-মার কোনো পরিচয়। তুমি তো জান, তুমি তো অন্তত তাঁদের দুজনকে চোখে দেখছ, কখনো কখনো প্রাণে মিলেছ, মনে মিলেছ। এই পাওয়াটুকুও তো কিছু পাওয়া। আর, তোমার বাবা-মা আলাদা থাকলেও কেউ কিন্তু আর বিয়ে করেননি—নূতন ঘর করেননি। তোমাকে নিয়েই তাঁরা আছেন, তুমিই তাঁদের সেতুবন্ধ। তুমি সাবালক হয়েছ, তুমি বাবা ও মার কাছে সমানভাবেই থাকতে পার বলে মনে হয়। এমনও হতে পারে, আরও একটু সময় গেলে তোমাকে পেতে চেয়ে মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের হৃদয়নিঃসৃত উদার আবেদন হয়তো তোমার বাবা-মার মধ্যে যে অন্তরালটুকু রয়েছে, তার সবটাই ধুয়ে মুছে দেবে। তুমি সেই অমোঘ দিনটির জন্য বাবা-মা দুজনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, অপেক্ষা করো। আর একটা কথা বলি, সবার পিতা, সবার মাতা হয়ে আছেন যে পিতা ও মাতা—তাঁদের দিকে মনটা একটু-একটু ঘুরিয়ে দাও। একটি সন্তানের মা না হয়েও যিনি সহস্র কোটি সন্তানের মা সেই শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন-পাঠ করো। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জানো। হৃদয় প্রসারিত হবে—পরম মাতা ও পরম পিতার স্পর্শ পাবে। তুচ্ছ ভেদ-বিভেদ ভুলে, ঘৃণা-জ্বালা ভুলে, হৃদয়ে ভালোবাসার, স্নেহের সমুদ্রস্বাদ পাবে।

প্রশ্ন ঃ আমি এখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমার-ই section-এ একটি মেয়ে আমার বন্ধু হয়ে যায়। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, আমি ওর থেকে প্রায় সাত মাসের ছোট। আমাদের সম্পর্ক ক্রমে খারাপ হতে থাকে। ক'দিন আগে আমার মার কাছ থেকে জানতে পারি যে স্কুলে ভর্তি করবার জন্য আমার বয়স কমানো হয়েছে। সেই থেকে আমি মানসিক অশান্তিতে ভুগছি। পড়াশুনার রীতিমতো ক্ষতি হচ্ছে। আমি জানি যে যতদিন এই ঘটনা স্মৃতি থেকে উবে না যাবে, ততদিন আমি অশান্তিতে ভুগব। আমার এই সমস্যার সমাধান বলে দিলে, চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

—নাম জানাতে অনিচ্ছুক

উত্তর ঃ তোমার হাতের লেখা বেশ সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ। তুমি পড়াশুনায় ভালো তা-ও তোমার নির্ভুল চিঠিটি পড়ে মনে হল। কিন্তু যে সমস্যার জন্য পড়াশুনায় তোমার মন-বিয়োগ হচ্ছে সেটি এই বয়সের বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা, কমবেশি সব ছেলে-মেয়ের মধ্যেই এইরকম কোনো-না-কোনো মানসিক দ্বন্দ্বজর্জর সমস্যা সাময়িক হলেও দেখা দেয়। তোমার মধ্যেও দেখা দিয়েছে। মেয়েটিকে বন্ধুর মতো গ্রহণ করার মধ্যে তো কোনো আবিলতা থাকার কথা নয়। তুমি ওর থেকে ছোট না বড়—এর এত বিচারের কী প্রয়োজন ছিল, এই সময়ে! তোমরা একসঙ্গে পড়, তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, এইটুকু-ই সুন্দরভাবে বজায় রাখো। ওর সুগুণ ও সৌন্দর্য তোমাকে আরও বেশি করে পড়ায় প্রেরণা দিক—এটাই সুস্থ বন্ধুত্বের নির্যাস। তুমি ৭ মাসের ছোট না বড় এটা ভুলে যাও। এবং এ থেকেই তোমাদের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকল—অথচ তুমি জানো যে তোমার বয়স ভর্তির সময় তোমার মা কমিয়েছেন। এখন তো তোমার বন্ধুও জানে যে তোমরা সমবয়সী—তোমার সহপাঠী, বন্ধু, অথচ বয়সে বড় না ছোট এই নিয়ে সব বন্ধুত্বটাই নষ্ট করে দিচ্ছ। অনাবিল বন্ধুত্বও যে কত ভালো হতে পারে—পড়াশুনায়, চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বের সব দিকে—এই সুস্থ প্রতিযোগিতায় তোমরা চলো, দেখবে পড়াশুনায় তুমি তোমার হৃত গৌরব ফিরে পেয়েছ। কর্তৃত্ব নয়, সহমর্মিতা ও বন্ধুত্ব যদি চাও তা হলে বয়সের হিসেবের কোনো দরকার নেই। লিখেছ, 'যতদিন এই 'জঘন্য' ঘটনা স্মৃতি থেকে উবে না যাবে, ততদিন আমি অশান্তিতে ভুগব।' তোমার মা, বয়স কমিয়ে তোমাকে ভর্তি করেছেন, এটাই কি 'জঘন্য ঘটনা' বলে মনে করছ! তোমার এই বয়সের, এই বয়ঃসন্ধির ভালোর দিকগুলোর দিকে দৃষ্টি দাও। আদর্শ সচেতনতা, সৌন্দর্য সচেতনতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা—এইগুলোর দিকে বেশি করে দৃষ্টি দাও, দেখবে তোমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে 'জঘন্য' বলে কিছু নেই। নূতনভাবে দেখতে শেখো, নূতনভাবে মিশতে শেখো, দেখবে সব বন্ধুত্বের মধ্যেই আনন্দ আছে, প্রেরণা আছে।

————

দুঃখীরাম শান্তিরাম

মণিলাল মুখোপাধ্যায়

দুঃখীরাম গেল উটি। শান্তিরাম পেল ছুটি। ও ঠিক করল, দুঃখীরাম দু'দিন বাদে ফিরল, কি না ফিরল, ও এখানে-সেখানে যাবে, একটু আনন্দ স্ফূর্তি করবে। ওরও তো মন বলে কিছু আছে, দেহটাই না হয় গেছে। তাছাড়া অনেক ছুটি পাওনা আছে। যেই ভাবল, অমনি বেরোল। ঘুরছে তো ঘুরছেই। দেখল জলের ওপর ফাঁকা নৌকোটা দুলছে তো দুলছেই। যেই শান্তিরাম ওঠে, নৌকোটা ছোটে। পাখিরা গান গায়। শান্তিরাম মনের সুখে দাঁড় বায়। ঘণ্টাখানেক পরে, একটা হিট্ করা গান ধরে ঃ

কেঁচো, কৃমি, টিকটিকি,
আরশোলা গিরগিটি,
যত সব অখাদ্য,
ভূতেদের বরাদ্দ।
রাতে কেন জাগব,
শ্মশানেতে থাকব?
পোড়োবাড়ি না পেলে
কেন জলে ভিজব?

আঁকু পাঁকু প্রাণটা,
গেল কোথা দেহটা?

হঠাৎ শান্তিরাম দেখল, নৌকোটা একটা বনের ভেতর ঢুকল। চারদিক চুপচাপ। একটা শব্দ ধুপধাপ। কী ব্যাপার! নৌকোটা থামিয়ে, ডাঙায় পা দুটো নামিয়ে, শব্দটা অনুসরণ করে, শান্তিরাম ঢুকে পড়ল বনের ভেতরে। যায়, যায়, আর গলা ছেড়ে গান গায়। এক সময় চুপ করে গেল। আসলে, হাওয়ায় চাপা কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে এল। কী ব্যাপার জানবার জন্যে, আরও কিছুটা ঢুকল বনে। একটা গাছের মাথায় উঠল। চারদিকে চাইল। এক জায়গায় দৃষ্টি গেল আটকে, দুটো লোক। একটা খুব লম্বা, একটা খুব বেঁটে। লম্বাটা রোগা, যে বেঁটে সে মোটা। তবে যা বড় গোঁফ, দেখে কপালে উঠবে চোখ। বেঁটে লম্বাকে বলছে, আমি মই দিয়ে নীচেয় নামছি। হীরে, মুক্তো, সোনা, রুপোর বস্তাগুলো রাখছি। তুই ওগুলো নিয়ে আয়। দেখবি একটাও না খোয়া যায়।

ঐ আসে লোকটা,
হাট্টা কাট্টা,
পেয়েছি সুযোগ যখন,
গলা টিপে ধরব।

ধু ধু খাঁ খাঁ,
বাঁই বাঁই সাঁ সাঁ,
কলকল হুড়মুড়,
ফিনফিনে ফুরফুর

কথা শুনে, শান্তিরাম বস্তাগুলো গোনে। লম্বা লোকটা একটা করে বস্তা

পিঠে রাখে, তারপর ভেতরে ঢোকে।

শান্তিরাম বুঝতে পারল, বেঁটে লোকটা ডাকাতের সর্দার। আর মাটির নীচে, ঘরের ভেতর, আছে সোনাদানার পাহাড়। কত লোকের সর্বনাশ করে, লুকিয়ে রেখেছে মাটির তলার ঘরে। একটু পরেই ওরা উঠে এল। গর্তের মুখে বড় একটা পাথর চাপা দিল। তারপর দুজনে মিলে কোথায় গেল।

যতই গর্তের মুখ ঢেকে রাখুক পাথরে, শান্তিরামকে কি কেউ আটকাতে পারে! গাছ থেকে নেমে যেই না শান্তিরাম নীচের ঘরে ঢুকল, ধনরত্নের পাহাড় দেখে চোখ টেরা হয়ে গেল। বস্তার পর বস্তা। দেখে মনে হবে হীরে, মুক্তো কত সস্তা। বেল পাকলে কাকের কী? ঠিক যেন কুকুরের কাছে ঘি।

শান্তিরাম বেরিয়ে আসে বন থেকে তারপর নৌকোয় চেপে এদিক-ওদিক ঘোরে, বসন্তপুর পরিক্রমা করে। কিন্তু শান্তিরাম তো আর মানুষ নয়, সে ভূত। নৌকোয় চাপতে ভালো লাগবে কেন? যখন সে নিজেই হাওয়া, কেন ভালো লাগবে হাওয়া খাওয়া! আমগাছে, তালগাছে পা রেখে, শান্তিরাম ছোটে ঝড়ের বেগে। এক জায়গায় এসে থেমে পড়ে। দেখল একটা দশ কি এগারো বছরের মেয়ে কাঁদছে উচ্চৈঃস্বরে।

ওর মা মেয়েকে ভোলাচ্ছে, কাঁদিস নে রেজিনা। এছাড়া আমার যে আর কোনো উপায় নেই, মা। তোর বাবা আমাকে ত্যাগ করল, তারপর আবার বিয়ে করল। তোদের খাওয়াব কি করে? তোর ভাইও অসুখে ভুগছে। জানি না বাঁচবে কি মরবে। চিকিৎসার জন্যে চাই গাদা গাদা টাকা। কোথা থেকে পাই? তাই তোকে বিক্রি করে দেখি যদি ওকে বাঁচানো যায়।

একটা মাত্র কুঁড়ে, তার দাওয়া জুড়ে কাঠ-কুটো। তারই এক পাশে, হাড়-জিরজিরে একটা ছেলে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে কাঁদছে আর বলছে, মা, বড্ড কষ্ট। আমি আর বাঁচব না।

মা ছেলের বুকে আছড়ে পড়ে, ওকথা বলিস নে, সোনা। ওকথা বলতে নেই।

—মা, কষ্টের কি শেষ নেই?

—ওরে রাজা বাপ, দারিদ্র এক অভিশাপ।

—মা, সেই রানীর গল্পটা বল না, যে বলেছিল দেশে আর একটা গরিবও রাখব না।

—গল্প শুনবি বাপ! বলছি। ওষুধ দিতে পারব না, খেতে দিতে পারব না। গল্প শোনাতে পারব, বাছা।

—বলো না, মা। সেই গল্পটা বলো।

—এক দেশে ছিল এক রাজা। রাজার একটি মাত্র মেয়ে। রাজা বুড়ো হল, তারপর মরে গেল। তখন মেয়ে হল রানী। সিংহাসনে বসেই বলল, মন্ত্রী, সেনাপতি, সবাই শোন আমার বাণী। রাজ্যে দারিদ্র থাকবে না, কেউ না খেয়ে মরবে না। রাজকর্মচারীরা ছুটল, গরিবদের নাম নিল। এরপর, হল ঘর। রোজ দু'বেলার, গেল খাবার।

রাজা শুধোয়, মা, খাবার কিছু নেই? একটা চালও পড়ে নেই? হাঁড়ি সব ফাঁকা?

—দেখছি, দেখছি, বাবা।

—তুমি তো কেবল বল দেখছি।

—আচ্ছা এখনই যাচ্ছি।

কিন্তু যাওয়া হল না। রাজা কাশতে শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে।

—রেজিনা— ওরে আমার কী হল রে!

ছুটে আসে রেজিনা। ওর কান্না থেমে যায়। রুগ্ন ভাইটার দিকে চায়।

—মা, তুমি এখনই সেই কসাইটার কাছে যাও। নিয়ে এস যা পাও। আমাকে বিক্রি করে ভাইকে বাঁচাও।

চিৎকার করে ওঠে রাজা, না, কখ্খনো না। কখ্খনো না। দিদি, তুই আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবি না। আমি ভাত চাই না, ওষুধ চাই না, ফল চাই না।

—তাই কি হয়! ভাত না পেলে, ওষুধ না খেলে, পথ্য না জুটলে, মানুষ বাঁচে না।

রাজা দেখল কসাই সামসুদ্দিন ঢুকল।

রেজিনা বুঝল, ওর যাবার সময় এল।

—রেজিনার মা, তুমি কিচ্ছু ভেব না। মেয়ে তোমার খেতে পাবে, পরতে পাবে, গাড়ি চেপে ঘুরে বেড়াবে।

এগিয়ে গেল রেজিনা, দাও, টাকা দাও। আমি রাজি।

—না, না, দিদি। ও লোকটা পাজি।

রাজা এমন করতে লাগল যে বাধ্য হয়ে তখনকার মতো রেজিনার যাওয়া স্থগিত হয়ে গেল। তবে কসাইটাকে পাশে ডেকে রেজিনা বলল, অবশ্যই যাচ্ছি কালকে।

সামসুদ্দিন কসাই দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বাড়ি যায়। মেয়েটা গেলে ঝি রাখতে হবে না। এ সুযোগ সে ছাড়বে না।

সামসুদ্দিন যেই গেল, রাজা মাকে ডাকল।—মা, ওষুধ খেলে রোগ সেরে যায়?

ওর মা সান্ত্বনা দেয়, তা যায় যদি রোগী ঠিক খায়।

—শুধু বড়লোকদেরই ওষুধ জোটে? গরীবদের অসুখ হলে তারা কীভাবে সেরে ওঠে?

—ভিক্ষে করে দ্বারে দ্বারে, হাটে। লোকের যদি প্রাণ কাঁদে, দু-দশ পয়সা দেবে।

—মা, বড়লোকদের অনেক টাকা থাকে, তাই না?

—হ্যাঁ, বাবা।

—কি করে বড়লোক হওয়া যায়?

ওর মায়ের উত্তর জানা নেই। তাই চুপ করে যায়।

ঠিক এই সময় রেজিনা ডাকে, শালিককাকু, ও শালিককাকু—

শালিক ওদের দাওয়ার কাছে আসে।

—কী বলছ গো মেয়ে?

—ভাইটার খুব অসুখ। একটু যাদু দেখাবে? তাহলে কিছুক্ষণ হয়তো চুপ করে থাকবে।

শালিক বলল, আহা! হাড় বেরিয়ে গেছে। দেখাচ্ছি বাবা, দেখাচ্ছি।

রাজা শুধোয়, তুমি টাকা আনতে পার?

শালিক একটু ইতস্তত করে তারপর বলে, আনতে পারি না, বাবা। তবে বানাতে পারি।

—কই দেখি?

শালিক একটুকরো ইট কুড়িয়ে নেয়। তারপর সেটা রাজাকে দেখায়। এরপর মন্তর পড়ে। তারপর শূন্যে একবার হাতটা ছোঁড়ে। বলে, এই দেখো টাকা। আবার এই চলে গেল শূন্যে। এই দেখো হাত ফাঁকা।

রাজা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, শালিককাকু, আমায় মন্তরটা শিখিয়ে দেবে?

শালিক বলল, মন্তর? তুমি শিখবে? ঠিক আছে। যা বলছি মনে রাখবে। হুস্ হাস্ ফিস্ ফাস্ এই দিচ্ছি ঢাকা, ভেতরে যা আছে সব হয়ে যা টাকা।

রাজা অবাক, এই মন্তর পড়লেই টাকা আসবে!

শালিক আর কী করে, ওকে ভোলাতে ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ। ভর সন্ধেবেলা চাইবে। আচ্ছা, আমি আজ আসি। যদি পারি কাল আসব বুঝলে, মাসি।

শালিক সরকার চলে যায়। রাজার মা বলে, আমি এখন আসছি বাবা। দেখি যদি কিছু পাই। রেজিনা, কোথায় গেলি—

রাজার মা বাইরে যায়। কিছুক্ষণ পরে, আবার ফিরে এল ঘরে। সঙ্গে রেজিনা। চোখে জল। এখনও থামেনি কান্না।

রেজিনা দেখল রাজার মাথার গোড়ায় একটা মাটির হাঁড়ি। ঢাকা খুলে দেখে ভেতরে ইট, পাথর এক কাঁড়ি। ও শুধোয়, রাজা, রাজা, ভেতরে এসব কে পুরেছে?

রাজা অতিকষ্টে একবার চায়, দিদি, সন্ধে হয়েছে?

—হ্যাঁ, কিছু বলার আছে?

—এবার মন্তর পড়ি? তাহলে টাকা পাব এক হাঁড়ি।

রাজার মা বলে, তাই পড়। এই নে বাছা হাঁড়িটা, ধর।

রাজা হাঁড়ির মুখটা ঢাকা দিয়ে বলে, হুস্, হাস্, ফিস ফাস্, এই দিচ্ছি ঢাকা। ভেতরে যা আছে সব হয়ে যা টাকা।

ওর মা বলে, এবারে হাঁড়িটা নিই, ওপাশে রেখে দিই।

—কেন, এখন টাকা হবে না?

—একটু দেখবি না? এই তো মন্তর পড়লি। অতগুলো ইট, পাথর টাকা হতে সময় লাগবে, বুঝলি?

কিছুক্ষণ পরে রাজা শুধোয়, মা, এবার খুলি?

রেজিনাকে ওর মা শুধোয়, ছেলেটাকে কি বলি?

—যখনই হোক, ঢাকা খুলতেই হবে। মা সজল চোখে বলে, কপাল। আরও কত কী সইতে হবে।

রাজা আবার তাকায়, দিদি, এবার হাঁড়িটা নিয়ে আয়। রেজিনা বলল, যাচ্ছি ভাই। একটু দাঁড়া।

এরপর মাকে বলল, কাল তো যেতেই হবে। আমাকে বিক্রি করে যা টাকা পাবে, তাই দিয়ে রাজাকে একটা ভালো ডাক্তার দেখাবে। রাজা কাঁদলে বলবে, তোর দিদি দু'দিন পরেই ফিরবে। মা, আমার জন্যে তুমি কেঁদো না।

রেজিনা ছেঁড়া একটা ব্যাগে, ওর ছেঁড়া একটা জামা, ছেঁড়া একটা প্যান্ট ঢুকিয়ে নিল আগে। ভুল হলে, অসুবিধে হবে ওদের বাড়িতে গেলে।

রাজা আবার মিটমিট করে চায়, তারপর যেই রেজিনাকে দেখতে পায়, বলে, আমি সব বুঝতে পারছি। তুই যদি চলে যাস, এই মাথায় হাত দিয়ে বলছি, আমি মরব, মরব, মরব।

ছুটে আসে ওর মা, ওসব কথা আর কোনোদিন বলবি না।

—দিদি চলে যাবে কেন? আকাশে যখন চাঁদ দেখা দেবে, তখন কে আমায় গল্প শোনাবে? যখন ঝমঝম করে বৃষ্টি নামবে, কে পুকুরপাড় থেকে আমার জন্যে শ্বেত-পুন্নিমে শাক আনবে?

—কী করব বাবা, টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছি, কিন্তু রোজই শুধু হাতে ফিরছি। টাকা থাকলে মন থাকে না, মন থাকলে টাকা থাকে না।

রাজা ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, দেখেছ ভুলে গেছি। হাঁড়ির ভেতর যেসব ইঁট, পাথর রেখেছি ওগুলো এতক্ষণ টাকা হয়ে গেছে। দিদি, ওটা নিয়ে আয় না। টাকা পেলে তোকে আর কোত্থাও যেতে হবে না।

রাজার মা একবার ছেলের মুখের দিকে চায়। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো আশায়। বেচারা! কতই বা বয়স। জানে না কঠোর বাস্তবের চেহারা। কিন্তু কতক্ষণ আর থামিয়ে রাখবে, একসময় আসবে হাঁড়ির ঢাকা খুলতেই হবে। তখন? হতাশার ধাক্কাটা যদি সামলাতে না পারে, তাহলে একটা কিছু ঘটবেই কিছুক্ষণ পরে।

—রেজিনা, হাঁড়িটা নিয়ে আয় তো, মা।

রেজিনা আপত্তি জানায়। তারপর যায়। রেজিনার চোখ দিয়ে ভাদ্রের বন্যা নামে। ও হাঁড়িটাকে রাজার কাছে রেখে একটু থামে, তারপর দ্রুত পালিয়ে যায় ওখান থেকে। ওর করুণ মুখটা দেখতে পারবে না নিজের চোখে।

—মা, দিদি—

চিৎকার করে ওঠে রাজা।

ওর মা ছুটে আসে। এসে দেখে ছেলের বুকটা চোখের জলে ভাসে।

ছুটে আসে রেজিনা।

—বলেছিলাম, দেখাতে হবে না। আমার কথা শুনলে না।

—দিদি, শালিককাকু বলেছিল মন্তর পড়লেই টাকা আসবে।

রেজিনা বোঝায়, ওরে বোকা, তাহলে শালিককাকুর অভাব কেন থাকবে।

মা বোঝায়, ও সব যাদুর ব্যাপার। কী দরকার অত ভাবার! রাত যখন শেষ হবে, আবার দিন আসবে। হাতে অনেক সময় পাব। দ্বারে দ্বারে যাব।

রাজার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে, সোনার টাকা! রুপোর টাকা! মা, দিদি, এক হাঁড়ি টাকা! মা ভিক্ষে করবে না। দিদি কোথাও যাবে না, আমি পেট ভরে দু'বেলা খেতে পাব। সোনার টাকা! রুপোর টাকা!

রাজার মা ছেলের মাথায় হাত বুলোয়, কী সব ভুল বকছিস! রেজিনা, দেখ তো ওর মাথার ঠিক আছে কিনা। আমি আর ভাবতে পারছি না।

রেজিনা রাজার বুকের কাছে মুখ নিয়ে যায়।

—রাজা, তুই তো আমার সোনার ভাই।

—দিদি! সোনার টাকা! রুপোর টাকা!

হঠাৎ রাজা উঠে পড়ে, তারপর দু'হাতে হাঁড়িটাকে ধরে যেই উপুড় করে, সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ি থেকে সোনা আর রুপোর টাকা পড়ে।

শান্তিরাম হাসে। ওরও চোখ জলে ভাসে।

ভাবল, এবার ওর কাজ শেষ। ছুটির একটা দিন কাটল বেশ। এইভাবে যদি মানুষের উপকার করা যায়, মনে শান্তি পাওয়া যায়। অপরের কাছ থেকে চুরি করে হয়েছে সম্পদের ভাণ্ডার। এইভাবেই হোক তার সদ্ব্যবহার।

ছবি : সন্দীপ দেয়াসী

কেরিয়ার গাইড

ডি. এ. চন্দ্রণ

বন নিয়ে বাঁচা

গ্রিন হাউস এফেক্টের গুঁতোয় আমাদের নাগরিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। আমরা এখন বাধ্য হচ্ছি সবুজায়নের দিকে ঝুঁকতে। বলছি একটি গাছঃ একটি প্রাণ। বাসভূমিকে সুন্দর করার প্রয়োজনে গাছের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণে বনসম্পদ সৃজন ও সংরক্ষণও একান্ত জরুরি, তাছাড়া দেশের অর্থনীতিতে বনসম্পদের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিশাল বনসম্পদ সংরক্ষণ ও বনসৃজনের কাজে দরকার প্রচুর দক্ষ কর্মী। যারা বনকে ভালোবাসে, বনে-জঙ্গলে ঘুরতে যাদের অনীহা নেই, তারা ফরেস্ট রেঞ্জারের পেশা বেছে নিতেই পারে।

বনসংরক্ষণ, বনসৃজন ইত্যাদি বিষয়ের সরকারি পদাধিকারী হলেন চিফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট। তাঁর অধীনে থাকেন কনজারভেটর। জেলার ক্ষেত্রে প্রধান পদাধিকারী হলেন জেলা বন অফিসার। জেলা আবার কয়েকটি রেঞ্জে ভাগ করা হয়। এক একটি রেঞ্জের প্রধান হলেন ফরেস্ট রেঞ্জার। ফরেস্ট রেঞ্জারের অধীনে বনরক্ষক ও অন্যান্য কর্মী কাজ করেন।

প্রতি বছর ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার অ্যাসিস্ট্যান্ট কনজারভেটর অব ফরেস্ট পদে লোক নিয়োগ করে থাকেন। যে পরীক্ষার মাধ্যমে এই নিযুক্তি সমাধা হয় সেটি হলঃ ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস এগজামিনেশন। সাধারণত প্রতি ফেব্রুয়ারি মাসে সংবাদপত্রে পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় জুলাই মাস নাগাদ। পরীক্ষায় বসতে হলে প্রার্থীকে স্নাতক হতে হবে এবং স্নাতক পর্যায়ে বিষয় হিসাবে পশুপালন ও পশুচিকিৎসা, প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, অঙ্ক, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, রাশিবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, বনবিজ্ঞান যে কোনো একটি অবশ্যই থাকা চাই। প্রার্থীর বয়স হবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হয়। লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় চোদ্দশো নম্বরের মধ্যে। ছয়শো নম্বরের পরীক্ষা আবশ্যিক বিষয়ে, বাকি আটশো নম্বর ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞান মুখ্য বিষয়। একজন প্রার্থী চারবার এই পরীক্ষায় বসতে পারেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয় তিনশো নম্বরের মধ্যে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে যেসব প্রার্থী নিযুক্ত হন তাঁদের ট্রেনিং দেওয়া হয় দেরাদুনের ইন্ডিয়ান কলেজ ও মুসৌরির লালবাহাদুর শাস্ত্রী একাডেমি অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে। এখান থেকে ট্রেনিং পাওয়ার পর তাঁরা বিভিন্ন রাজ্যে প্রফেশন্যাল ফরেস্টার হিসাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট কনজারভেটর, ডেপুটি কনজারভেটর, চিফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট—বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ওয়েস্টবেঙ্গল ফরেস্ট সার্ভিস অ্যান্ড সাব অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস এগজামিনেশন পরিচালনা করেন এবং সফল প্রার্থীদের সরকারি ফরেস্ট অফিসার এবং রেঞ্জার পদে নিয়োগ করেন। পরীক্ষা দেবার যোগ্যতা ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষার মতোই। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমেই প্রার্থী নিয়োগ করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় আটশো নম্বর বরাদ্দ থাকে আবশ্যিক বিষয়ের জন্য। বাংলা, ইংরাজি, সাধারণ জ্ঞান এবং ঐচ্ছিক বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়।

ভবিষ্যতে যাঁরা বনপ্রশাসকের পেশা বেছে নিতে চান তাঁরা বন সংক্রান্ত কোর্স করতে পারেন বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ইনস্টিটিউট থেকে। যেমন ঃ (১) ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট ঃ এখানে ফরেস্ট্রি ম্যানেজমেন্টের দু'বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়। ভর্তির যোগ্যতা মাধ্যমিক স্তর থেকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। ভর্তির জন্য কমন অ্যাডমিশন টেস্টে বসতে হয়। পরীক্ষার আয়োজন করেন কর্তৃপক্ষ। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে বাছাই করা হয়। মনোনীত প্রার্থীদের স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়। এখানে ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে এম. ফিল করা যায়। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করেছেন এমন ছাত্রছাত্রীও এখানে ভর্তি হতে পারেন। যোগাযোগ—ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট, নেহরুনগর, ভোপাল।

(২) ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঃ বনবিদ্যার পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পড়ানো হয়—এম. এসসি ইন ফরেস্ট্রি এবং এম. এসসি ইন উড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। স্নাতক পর্যায়ে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করলে ভর্তির পরীক্ষায় বসা যায়। যোগাযোগ—ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পোঃ নিউ ফরেস্ট, দেরাদুন।

(৩) ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া, দেরাদুন ঃ এখানে অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রিতে এম. এসসি পড়ানো হয়। এছাড়া দেশের বেশ কয়েকটি ইউনিভার্সিটিতে ফরেস্ট্রি নিয়ে পঠন-পাঠন, গবেষণার সুযোগ আছে। যেমন, বিরসা এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি, রাঁচি; ওড়িশা ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, ভুবনেশ্বর ; গোবিন্দ বল্লভ পন্থ ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, নৈনিতাল ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরেস্ট্রি নিয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে। কার্শিয়াঙের ইস্টার্ন ফরেস্ট রেঞ্জার্স কলেজে ফরেস্ট রেঞ্জার ট্রেনিং দেওয়া হয়। উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স, কেমিস্ট্রি, বটানি, জুলজি প্রভৃতি যে কোনো একটি বা বেশি বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞানশাখায় পাশ করলে এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করা যায়। বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। শারীরিক মান ঃ পুরুষ প্রার্থীর উচ্চতা ১৬৩ সেমি, মহিলার ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি। বুকের ছাতি ৮৪ সেমি। ট্রেনিং কাল দু'বছর। সেশন শুরু মে মাসে। ভর্তির বিজ্ঞাপন বেরোয় জানুয়ারি মাস নাগাদ। কলকাতায় প্রশিক্ষণের জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে—ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর ওয়াইল্ড লাইফ রিসার্চ, ১২২ বি সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০২৯ ঠিকানায়।

কথা দিয়ে

যদুপতি মল্লিক

ছোট বোন ঝুমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেল একরকম হঠাৎই। ঝুমা আমার একমাত্র বোন। মাস-দুই আগে চুঁচুড়া থেকে ঝুমাকে যেদিন প্রথম দেখতে আসে সেদিন নিখিল ছিল আমাদের বাড়িতেই। নিখিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই কলেজে ভর্তি হয়ে একসঙ্গে কয়েকদিন নতুন ক্লাশ করা থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারপর দুজনে বি. এ পাশ করে বেরোনোর পর প্রায় বছর-দশ পার হয়ে গেছে। আমাদের বন্ধুত্ব এতোটুকু নষ্ট হয়নি। বর্তমানে দুজনের কর্মস্থল যদিও দু'দিকে। নিখিলের বর্ধমান, আর আমার কলকাতা।

নিখিলের বাড়ি বর্ধমানের এক গ্রামে। হুগলির বাগাটি, মগরা শ্রীগোপাল ব্যানার্জি কলেজে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। নিখিল কলেজের হস্টেলে থেকে পড়তো। কলেজে পড়াকালীন ও আমার সঙ্গে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে চলে আসতো। থাকতো, খেতো। নিখিল ছিল খুব মিশুকে। আর স্বভাবটাও ছিল ভারি মিষ্টি। ওর এই সব গুণের জন্যে আমি ছাড়াও বাড়িতে বাবা, মা, দাদা, বোনও খুব ভালোবাসতো ওকে। নিখিল ওর বাবা, মা-র একমাত্র সন্তান। নিজের কোনো বোন না থাকায় নিখিল ঝুমাকে নিজের বোনের মতোই ভালোবাসতো। কলেজে বন্ধুত্ব হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন সে যেখানেই থাকুক না কেন, যথাসময়ে ঠিক এসে উপস্থিত হয়েছে। ঝুমার হাতে ভাইফোঁটা নিতে তার দারুণ আগ্রহ ছিল।

চাকরি করার কয়েক বছর পর নিখিলকে অনেকটা দূরে বদলি করে অফিস থেকে। পাত্রপক্ষের তরফ থেকে ঝুমাকে প্রথম দেখতে আসার দিন আমাদের বাড়িতে উপস্থিত থাকাকালীন বাইরের লোকজন চলে যাওয়ার পর সন্ধের সময় মা, আমি, ঝুমা, নিখিল একসঙ্গে গল্প করছিলাম। তখন কী একটা কথায় নিখিল হাসতে হাসতে বলেছিল, 'দেখ ঝুমা, তোর এই দাদা আর যাই হোক, কথা দিয়ে কথা রাখে। আমি যেখানেই থাকি, যতো দূরেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, কথা দিচ্ছি— তোর বিয়ের দিন উপস্থিত হবোই!'

এরপর দেখতে দেখতে মাস দুই পার হয়ে গেল। এল ঝুমার বিয়ের সেই দিনটি। বাড়িভর্তি আত্মীয়-স্বজন। নানা কাজের ব্যস্ততার মধ্যে বারে বারেই নিখিলের অনুপস্থিতির কথা মনে করে মন খারাপ করছে আমার। কেবলই ভাবছি, কেন যে নিখিলটা এখনো উপস্থিত হচ্ছে না! এই রকম চিন্তায় সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল, একসময় সূর্য অস্ত গেল। ওর কথা ভেবে যখন বেশ অধৈর্য হয়ে উঠেছি, তখন ঠিক সন্ধের মুখে হন্তদন্ত হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল নিখিল। হাতে একটা উপহারের বাক্স। আমি বেশ খানিকটা অবাক হলাম ওকে দেখে। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। এলোমেলো চুল, মুখে-চোখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, জামাটাও ভেজাভেজা। এমন বিপর্যস্ত চেহারা কেন নিখিলের! এ-সব দেখে আমি ভ্রু কুঁচকে ওকে জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছে তোর? তোকে এ-রকম লাগছে কেন?' নিখিল একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'কই, কিছু হয়নি তো!'

তারপর কথা ঘুরিয়ে বলল, 'কই, ঝুমা কই?'

বললাম, 'আয়।' ওকে নিয়ে গেলাম, যে ঘরে কনের সাজে সেজে বসে আছে ঝুমা।

ওকে দেখে ঝুমা ব্যগ্র হয়ে কিছু বলতে যেতেই তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে নিখিল বলল, 'হাতে একদম সময় নেই রে, অত্যন্ত জরুরি একটা কাজে আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

আমি খুব অবাক হয়ে বললাম, 'সেকি? এক্ষুনি চলে যাবি কি? বর

দেখবি না, খাবি না? তাছাড়া এখন কী করে যাওয়া হবে তোর?’

ঝুমা বলল, ‘এখন তোমার কিছুতেই যাওয়া হবে না নিখিলদা! আমি তোমাকে এ-রকম ভাবে কিছুতেই যেতে দেব না!’

আমি বললাম, ‘ঠিকই তো! আজকের দিনে তোকে আমি এ-ভাবে ছাড়তে পারি?....কী হয়েছে বল তো তোর? সব খুলে বল আমাকে।’

নিখিল ব্যস্তভাবে বলল, ‘কী হবে! জরুরি কাজটার জন্যেই.....।’

কথার মাঝে আমি বাধা দিয়ে বললাম, ‘রাখ তোর জরুরি কাজ! তাছাড়া মা-বাবা তোর এ-রকম কথা শুনলে কী ভাববে?’

নিখিল বলল, ‘না রে, যেতে আমাকে হবেই। কোনো উপায় নেই। মাসিমা, মেসোমশাইকে কিছু বলিস না। কেন যেতে হচ্ছে পরে সব জানতে পারবি!’

এরপর ঝুমার হাতে উপহারের বাক্সটা তুলে দিয়ে বলল, ‘আসি বুঝলি, দেরি হয়ে যাচ্ছে।’

আমি অনুনয় করে বললাম, ‘তাহলে অন্তত কিছু খেয়ে নে?’

নিখিল আপত্তি করে বলল, ‘না রে, এখন কিচ্ছু খেতে পারব না।’

আমি আকুল ভাবে বললাম, ‘তুই সত্যিই চলে যাচ্ছিস?’

নিখিল বিষণ্ণভাবে বলল, ‘হ্যাঁরে।’

আমি ওর পিছন পিছন ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বললাম, ‘চল্ তাহলে তোকে বাস-স্টপেজ পর্যন্ত এগিয়ে দিই।’

নিখিল তাড়াতাড়ি বলল, ‘তার দরকার নেই। বাড়িতে এখন অনেক কাজ, তোর এখন কোথাও যাওয়া চলবে না।’

আমাকে আর কোনো কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে লোকজনের মধ্যে দিয়ে পথ করে দ্রুত পায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

এর ঠিক সাতদিন পর ডাকে এল একখানা চিঠি। চিঠিটা লিখেছেন বর্ধমানের গ্রাম থেকে নিখিলের বৃদ্ধ পিতা। চিঠিটা পড়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। শিরদাঁড়া বেয়ে দারুণ একটা হিমশীতল শিহরন বয়ে গেল। চিঠির বক্তব্য এই রকম : ঝুমার বিয়েতে আসার জন্যে সেদিন সকালেই রওনা হয় নিখিল। কিছুদূর আসার পরেই ঘটে যায় বাস দুর্ঘটনা। যে বাসে চড়ে নিখিল আসছিল সেই বাসটির সঙ্গে একটি লরির মুখোমুখি জোর সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলে সঙ্গে সঙ্গেই পাঁচজনের মৃত্যু হয়। তার ভেতর নিখিলও ছিল।

চিঠিটা পড়ার পর একটা প্রশ্ন আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল— ঝুমার বিয়ের দিন সকালে যদি নিখিল বাস দুর্ঘটনায় মারা গিয়ে থাকে, তাহলে সন্ধ্যায় উপহারের বাক্স হাতে যাকে দেখলুম সে তবে কে? হঠাৎ মনে পড়ে গেল, নিখিল ঝুমাকে কথা দিয়েছিল, সে যেখানেই থাকুক, যতো দূরেই থাকুক, যে অবস্থাতেই থাকুক, তার বিয়ের দিন সে উপস্থিত হবেই! তাই কি এভাবেই সে কথা রাখল!

তোকে এ-রকম লাগছে কেন

ছবি ঃ রঞ্জন দত্ত

সাদা দাগ নির্মূল অভিযান

সাদা দাগ অসাধ্য নয়

কয়েক বছরের নিরন্তর পরিশ্রম এবং অনুসন্ধান পশ্চাৎ সাদা দাগের চিকিৎসায় সাফল্য লাভ করেছি। ইহা এত তেজ ও প্রভাবী যে চিকিৎসা শুরু হতেই দাগের রং বদলাতে থাকে এবং শীঘ্রই দাগ হবার কারণগুলি নির্মূল করে ত্বকের রংয়ের মিলিয়ে দেয়। এখন প্রচার হেতু **“প্রথমে পরীক্ষা করুন যোজনার”** অন্তর্গত **15 দিনের ঔষধি ফ্রী দেওয়া হচ্ছে।** যাহাতে প্রথমে পরীক্ষা করে গুণ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তবেই চিকিৎসা করান। এজন্য নিরাশ রোগী এবং অন্য কোথায় চিকিৎসা করাচ্ছেন তারাও এই যোজনার লাভ অবশ্যই নিন। রোগীর বয়স, দাগের স্থান এবং কত দিনের অবশ্যই লিখে পাঠান।

নোট ঃ-চিকিৎসার দাবী যে কেউ করতে পারে, বিশ্বাস লাভ দেখে করুন।

SHYAM AYURVED BHAVAN (Regd.) ***P.O. KATRI SARAI (GAYA) PIN-805105*** **☎ : 06112-289311**

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

চন্দ্রর গুগলি

না, ক্রিকেটার ভাগবৎ চন্দ্রশেখরের কথা বলছি না। এ চন্দ্র হল নাসার (NASA) এক্সরে মানমন্দির (X-ray observatory)। চন্দ্র তার যন্ত্রপাতি দিয়ে মহাকাশে অনেক খুঁজে, পেয়েছে এক কোয়াসার (Quasar) যার জন্ম হয়েছিল বিগ্‌ব্যাং বা মহাজগত সৃষ্টির কমবেশি দশ লক্ষ বছর পরে। চন্দ্র মানমন্দির-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এই কোয়াসারে রয়েছে একটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোল যেটি থেকে

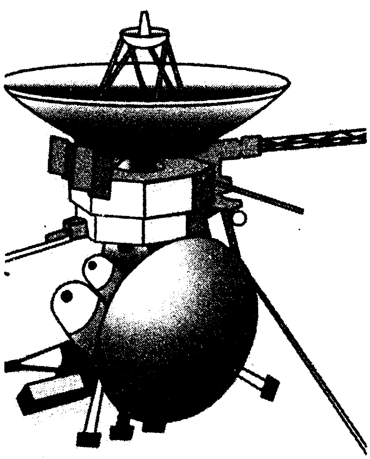

কুড়ি কোটি সূর্যের সমপরিমাণ শক্তি নির্গত হয়ে চলেছে। এ ধরনের প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড ব্ল্যাক হোলের উপস্থিতি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির তত্ত্ব, তারমণ্ডল, ছায়াপথ এবং কৃষ্ণগহ্বর বিষয়ক যাবতীয় তত্ত্বকে নস্যাৎ করার মতো জায়গায় ঠেলে দিল। চন্দ্রর গুগলির মতো—ঠিকমতো হলে যেকোনো ব্যাটসম্যানই আউট। দেখা যাক বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্বগুলির কী দশা হয়।

সুপার জাম্বো এসে গেল

এতদিন পর্যন্ত জাম্বো জেট B-747-400-ই ছিল সবচেয়ে বড় বিমান। যার খালি অবস্থায় ওজন ১৫০

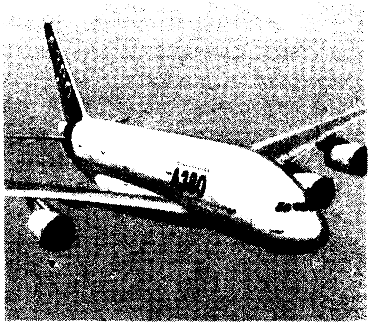

টন এবং ওড়ার সময় ওজন (যাত্রী ও জ্বালানীসহ) ৩৭৭ টন। লম্বায় ৭০.৭ মিটার বিমানটির উচ্চতা ১৯.৩ মিটার। ডানা দুটির দৈর্ঘ্য ছিল ৬৪.৪ মিটার। একটানা উড়ান ক্ষমতা ছিল ৮,০০০ কিমি। প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন এর চেয়ে বড় বিমান আকাশে ওড়ানো সম্ভব নয়। না, এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন ইউরোপের এয়ারবাস নির্মাণ কোম্পানির বিজ্ঞানীরা। জানুয়ারি ২০০২ সালে তাঁরা সবচেয়ে বড় যাত্রী ও মাল পরিবাহী বিমান তৈরির প্রকল্প হাতে নেন। মার্চ ২০০৫-এ তাঁরা এই বিমানের পরীক্ষামূলক উড়ান শেষ করেছেন। বাণিজ্যিক উড়ান আরম্ভ হবে জানুয়ারি ২০০৬ থেকে। প্রতিটি বিমানের দাম পড়বে বারো হাজার কোটি টাকা। একনাগাড়ে ১৪,১০০ কিমি উড়ান ক্ষমতাসম্পন্ন বিমানটির পরিবহন ক্ষমতা জাম্বো 747-এর দ্বিগুণ। লম্বায় বিমানটি ৭৩ মিটার, উচ্চতা ২৪.১ মিটার। খালি অবস্থায় ওজন ২৭৬ টন। উড়ানের সময় ওজন ৫৪০ টন। ডানা দুটির দৈর্ঘ্য ৮০ মিটার। বিমানটির নাম A-380-800। বিমানটিতে আরাম ও বিনোদনের সব ব্যবস্থাই থাকছে।

বাচোকোলেট

আসলে বলতে চাই বাঃ চকোলেট। এতদিন তো বেশি চকোলেট খেয়ো না, দাঁত খারাপ হয়ে যাবে, মোটা হবে, খিদে কমে যাবে—এসব শুনতে শুনতে কানের দফারফা। কিন্তু লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের গবেষক বিজ্ঞানীরা অন্য কথা শোনাচ্ছেন। তাঁদের মতে যে কোডিনকে কাশির সবচেয়ে ভালো ওষুধ বলে, তার চেয়েও ভালো ওষুধ আছে চকোলেটে। ওষুধটির নাম থিওব্রোমিন (Theobromine)। বিশুদ্ধ চকোলেটের অন্যতম উপাদান। থিওব্রোমিন পুরনো অর্থাৎ ক্রনিক কাশিকেও থামাতে পারে, ভালো করতে পারে। যা বর্তমানে প্রচলিত অনেক কাশির ওষুধই পারে না। তাই বাচোকোলেট। চকোলেট আবার খাবো।

রোবোসেপিয়েন

মানুষের বিজ্ঞানসম্মত নাম হোমো-সেপিয়েন সেপিয়েন। প্রাণীকুলে মানুষ শ্রেষ্ঠ তার উন্নত মগজ বা মস্তিষ্কের জন্য। রোবট তথা যন্ত্রমানবকুলেও অতি সম্প্রতি শ্রেষ্ঠ রোবট তৈরি হয়েছে। নির্মাতারা আদর করে নাম দিয়েছেন রোবোসেপিয়েন। উন্নত প্রযুক্তি এবং

ব্যবহারিক জৈবসঞ্চালন রোবোটিকস (Applied Biomorphicrobotics) প্রয়োগ করে রোবোসেপিয়েনকে তৈরি করা হয়েছে। ব্যাটারি চালিত রোবো যে কোনো জিনিস তুলতে, ছুঁড়ে ফেলতে, বয়ে নিয়ে আসতে, নাচতে এবং এরকম প্রায় সাতষট্টি ধরনের কাজ করতে পারে। এই রোবোর জন্য কোনো কম্পিউটার দরকার নেই। কারণ তার দেহের মধ্যেই সব কাজের প্রোগ্রাম দেওয়া আছে। রোবো শিশুদের ভালো খেলার সঙ্গী। এর খবর আরো বেশি জানতে হলে বা তাকে পেতে হলে লগ অন করো www. hobbytron. net।

প্রত্যাবর্তন

রামপ্রসাদ দে

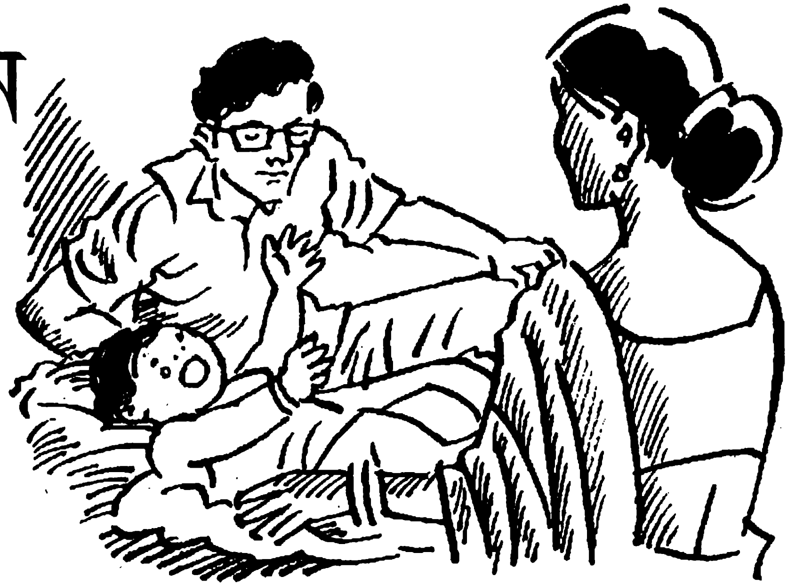

আঃ! এ তো মহামুশকিল হল।—স্বগতোক্তি করে উঠলেন অলকবাবু।—কিছুতেই যে বাচ্চাটা চুপ করছে না। এখন কী করি? ওর মায়ের তো এখনো দেখা নেই!

অলকবাবুর দেড় বছরের ছেলে পুলক। ওঁরা আদর করে ডাকেন, সোনামণি। ওর মা—অলকবাবুর স্ত্রী সুনয়না দেবী, আজ বাপের বাড়ি গেছেন।

উনি বাপের বাড়ি সাধারণত কমই যান। ওঁদের বিয়ে হয়েছে চার বছর। বছরে দু-একবারের বেশি ওঁর বাপের বাড়ি যাওয়া হয় না, যদিও ওনার বাপের বাড়ি বেশিদূর নয়। বাসে মাত্র আধঘণ্টার রাস্তা।

আজ সকালেই সুনয়নার বড়দা ফোন করেছিলেন। ওনার বাবা নাকি আজ সকালে হঠাৎ-ই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। একেবারে যায়-যায় অবস্থা। খবরটা শুনে উনি খুবই ভেঙে পড়েন। অলকবাবু ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তুমি বরং এখন একাই গিয়ে দেখো যে অবস্থা কিরকম। তেমন বুঝলে একটা ফোন কোরো। আমি তখন সোনামণিকে নিয়ে যাব।

উনি আঁতকে উঠে বলেছিলেন, সে কি! ওকে রেখে আমি কি করে যাব?

অলকবাবু তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, ওর জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি ওর খাবার-দাবার ঠিক করে রেখে যাও। খিদে পেলে আমি খাইয়ে দিতে পারব। তাছাড়া এখন বিপদের বাড়িতে তুমি ওকে নিয়ে গিয়ে কী করবে? তোমার বাবাকে দেখবে, নাকি ছেলেকে সামলাবে? একাই যাও। যদি দেখ সব ঠিক আছে, তাহলে দুপুরেই ফিরে এসো। আর, ভগবান না করুন, যদি অবস্থা খারাপ হয়, একটা ফোন করে দিও। পৌঁছে যাব। এখনি সবাই গিয়ে ভিড় করার কোনো মানে হয় না।

সুনয়না দেবী একটু ভেবে তাতেই রাজি হলেন। দুধ গরম করে, বার্লি তৈরি করে, সব হট কেসে রেখে দিলেন। যাতে ওর খিদে পেলে সঙ্গে সঙ্গে খাইয়ে দেওয়া যায়। তারপর ছেলেকে কোলে নিয়ে একটু আদর করলেন। চুমোয় চুমোয় ওর গোলাপি গাল দুটো ভরিয়ে দিলেন।

যাবার আগে বলে গেলেন, সোনামণির দিকে কিন্তু খুব ভালো করে খেয়াল রেখো। গল্পের বইতে ডুবে যেয়ো না।

অলকবাবু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

সেই যে উনি বেরিয়ে গেছেন, আর কোনো খবর নেই। অবস্থা খারাপ হলে টেলিফোনে খবর দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু কোনো ফোন আসেনি। তার মানে খবর ভালই। উনি নিজে ফোন করে যে খবর নেবেন, সে উপায় নেই। ওঁর শ্বশুরবাড়িতে ফোন নেই।

এদিকে বাচ্চাকে নিয়ে উনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রথমটায় বেশ ভালোই ছিল। একটুও কান্নাকাটি করেনি। ওর মা চলে যাবার পর অলকবাবু ওকে একবার খাইয়ে দিয়েছিলেন। শান্ত ছেলের মতো খেয়ে নিয়ে দোলনায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। অলকবাবুও নিশ্চিন্তে একটা বই নিয়ে পড়তে শুরু করেছিলেন। কিন্তু প্রায় তিনটের সময় হঠাৎ চিৎকার করে উঠে পড়ে। তার পর থেকে এমন কান্না শুরু করেছে যে কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ আগে খাওয়ানো হয়েছে। ভাবলেন, নিশ্চয়ই ওর খিদে পেয়েছে। দুধের বোতলটা নিয়ে ওকে খাওয়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই খাওয়াতে পারলেন না। হাতে করে ঠেলে বোতলটা সরিয়ে দিতে চাইছে।

অনেক চেষ্টা করেও উনি না পারলেন ছেলেকে খাওয়াতে, না পারলেন কান্না থামাতে। শেষে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ কোনো অসুখে পড়ল না তো? কী করবেন, ভেবে পেলেন না।

মিউজিশিয়ান ঘড়ি টুং-টাং আওয়াজ করে জানিয়ে দিল পাঁচটা বাজছে। পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহ। পাঁচটা মানেই প্রায় সন্ধ্যা। অনেক চেষ্টায় সোনামণিকে কিছুটা দুধ খাওয়াতে পারলেও কান্না কিছুতেই থামছে না। ক্লান্ত হয়ে পড়লে কান্নার রেশ কিছুটা কমে আসছে, কিন্তু একটু পরেই আবার পুরোদমে শুরু করছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চারপাশ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। এমন সময় সদর দরজায় কারো পায়ের আওয়াজ পেলেন। বেরিয়ে এসে দেখেন দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকছেন সুনয়না।

স্ত্রীকে দেখে উনি নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন, যাক, তুমি এসে পড়েছো! আর সামলাতে পারছিলাম না। নাও ওকে চুপ

করাও। শিশুরা মাতৃক্রোড়েই সুন্দর এবং নিশ্চিন্ত, পিতৃক্রোড়ে নয়।

উনি একটু হেসে বললেন, দাও। হাসিটা অদ্ভুত দেখাল।

সোনামণিকে কোলে নিয়ে চুপ করাতে লাগলেন। কি আশ্চর্য! মিনিট খানেকের মধ্যেই ও চুপ করে গেল! বাকি দুধটুকুও খেয়ে ফেলল।

অলকবাবু বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন, সত্যি, মা আর তাঁর শিশুর সম্পর্ক কতটা গভীর! মায়ের কোলে যেতেই কেমন চুপ করে গেল! আর উনি হাজার চেষ্টা করেও চুপ করাতে পারেননি।

এসব ভাবছেন, হঠাৎ মনে হল, অনেকক্ষণ থেকে কিসের যেন একটা গন্ধ পাচ্ছেন। যতদূর মনে পড়ছে, সুনয়না আসার পর থেকেই পাচ্ছেন গন্ধটা। গন্ধটা খুবই পরিচিত, অথচ কিসের গন্ধ কিছুতেই মনে পড়ছে না।

সুনয়না দেবী এরই মধ্যে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন। ওকে দোলনায় শুইয়ে দিয়ে বললেন, তুমি তো সারা দিনই বাড়িতে বসে আছ। এখন বরং একটু ঘুরে এসো।

অলকবাবু মনে মনে খুশি হয়ে বললেন, সেই ভালো। ঘুরে এসে বরং চা খাব।

সুনয়না দেবী তাড়াতাড়ি বললেন, না না, চা যদি খাবে, তবে এখনই খেয়ে যাও। আর হয়তো চা করে দিতে পারব না।

—কেন, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

—না না, সেসব কিছু নয়। আমি তো বেশিক্ষণ থাকতে পারব না!

—থাকতে পারবে না! কোথায় যাবে?

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে উনি তাড়াতাড়ি চা করে আনলেন। চা খেতে খেতে অলকবাবু জিগ্যেস করলেন, তোমার বাবার অবস্থা ভালো তো?

—হ্যাঁ, বাবা ঠিক আছে। ডাক্তার বলেছেন, ভয়ের কিছু নেই।

—যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বলে অলকবাবু বেরিয়ে এলেন।

কিছুদূর এসেছেন, হঠাৎ দেখলেন উল্টোদিক থেকে একটা বাইক প্রচণ্ড স্পিডে আসছে। উনি পীচ থেকে নেমে গেলেন। কিন্তু বাইকটা ওঁর কাছে এসে থেমে গেল। অলকবাবু দেখলেন, চালক তাঁর পরিচিত। সুনয়নার দাদা সুবিমল। তিনি সকালে ফোন করেছিলেন।

সুবিমলবাবু বললেন, অলক, কোথায় যাচ্ছো, বাড়িতে চলো। একটা খারাপ খবর আছে!

—শ্বশুরমশায়ের অবস্থা কি আবার খারাপ হয়েছে?

—না না, বাবা ঠিকই আছে। তুমি বাড়িতে চলো, বলছি।

বাইকের পিছনে অলকবাবুকে চাপিয়ে সুবিমলবাবু বাড়ির সামনে এসে থামলেন। বাইকটা দাঁড় করাতে করাতে জিগ্যেস করলেন, পুলক কার কাছে? দরজা খোলা?

—কেন; ওর মা রয়েছে তো!

কথাটা শুনেই সুবিমলবাবু ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। বললেন, ক—কী বললে? পুলক কার কাছে?

—ওর মা—মানে আপনার বোনের কাছে। ও ভেতরে রয়েছে, চলুন না। একটু আগেই ফিরল।

—তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, অলক? সুনয়না এখানে আসতেই পারে না। কই, তাড়াতাড়ি ভেতরে চলো তো। বলেই উনি অলকবাবুকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

দুজনেই দেখলেন, পুলক দোলনায় নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু সুনয়না নেই। সব ঘরগুলো অলকবাবু ভালো করে খুঁজে এলেন। কিন্তু কোথাও উনি নেই।

অলকবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, এই তো মিনিট পাঁচেক আগে ওকে বাড়িতে রেখে বেরোলাম। এর মধ্যে কোথায় গেল?

সুবিমলবাবু বললেন, তোমার কোথাও একটা ভুল হচ্ছে! সুনয়না এখানে আসতেই পারে না।

এরপর উনি যা বললেন, তা হল, দুপুর দুটো নাগাদ সুনয়না ওখান থেকে বাস ধরবে বলে বেরিয়ে যান। সুবিমলবাবু নিজে এসে ওঁকে বাসে তুলে দেন। কিন্তু বাসটা মিনিট দশেক চলার পরই কোনো কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা বটগাছে ধাক্কা মারে। অ্যাক্সিডেন্টের ফলে বাসের সব যাত্রীই গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সুনয়নার মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত লেগেছিল। মস্তিষ্কের ভেতরে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। হাসপাতালে গিয়েই উনি মারা যান, প্রায় তিনটের সময়।

সুবিমলবাবু খবর পেয়ে সাড়ে চারটা নাগাদ হাসপাতালে যান। উনিই মৃতদেহ শনাক্ত করেন। তারপরই এখানে ছুটে এসেছেন।

অলকবাবু তো প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাননি। যাকে মাত্র পাঁচ মিনিট আগে দেখেছেন, সে ঘণ্টা তিনেক আগে মারা গেছে, কি করে হতে পারে!

সুবিমলবাবু জোর করে ওনাকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। সোনামণিকেও এনেছেন। ও এখনো ঘুমোচ্ছে।

সুনয়না দেবীর মৃতদেহ দেখে প্রাথমিক শোকটা কাটিয়ে ওঠার পর ভাবতে লাগলেন, যদি সুনয়না তিনটেয় মারা যায়, তবে পাঁচটার পরে সে কী করে ওঁর ঘরে আসতে পারে! ব্যাপারটা ভাবতে গিয়েই ওঁর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। তবে কি...!

নিশ্চয়ই তাই। ও যে বাড়িতে গিয়েছিল তার জ্বলন্ত প্রমাণ হল সোনামণি। ও যে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, এ তো সুনয়নার জন্যই। হঠাৎ একটা ব্যাপার ওঁর মনে পড়ল। সোনামণি ঠিক তিনটের সময়-ই চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। ও কি তবে বুঝতে পেরেছিল? তাছাড়া সুনয়না ঘরে ঢুকতেই একটা গন্ধ পেয়েছিলেন। সেটা হাসপাতালের যে ওষুধ-ওষুধ গন্ধ—তাই। এখানে ঢুকতেই গন্ধটা চিনতে পেরেছেন।

কিন্তু মৃত্যুর পরেও কি কিছু আছে? যদি থাকেও, সুনয়না বাড়িতে ফিরে এল কেন? শুধু কি সোনামণিকে ঘুম পাড়াবার জন্য? নিজের সন্তানের কান্না সহ্য করতে পারেনি বলেই কি পরলোক থেকে ফিরে এসেছিল? সন্তানের প্রতি মায়ের এতই স্নেহ, ভালোবাসা!

ছবি : বিজন কর্মকার

ডাকটিকিটে কত কি

কবিতা রায়

৩৫০ বছরের প্রাচীন শহর

কলকাতার মতন ফিনল্যান্ডের একটি শহরকে নিয়েও বেশ হইচই হচ্ছে। ইতিমধ্যে শহরটি ৩৫০ বছর পার করেছে। শান্ত এই শহরটির নাম স্যাভোনলিনা। ফিনল্যান্ডের পুব দিকে মনোরম সাইমা লেকের মাঝ বরাবর এই শহর গড়ে উঠেছে। শহরের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অংশই জল দিয়ে ঘেরা তাই যান-চলাচলের প্রধান কেন্দ্র রূপে স্যাভোনলিনা ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছে। তবে সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও রাশিয়ার প্রান্তিক শহর হিসেবে একে সামলাতে হয়েছে যুদ্ধের নানান বিভীষিকা। ফলে প্রথম দিকে তেমন করে এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি। তবে বাল্টিক সাগরে যাবার পথ হিসেবে যখন সাইমা লেক উন্মুক্ত হল তখন থেকেই শহরটির যা কিছু উন্নতি।

১৪৭৫ সালে তৈরি একটি প্রাচীন দুর্গ এখনও শহরের প্রধান প্রতীক রূপে চিহ্নিত। দুর্গটির নাম ওলাভিনলিনা। ছোট্ট এই দুর্গটি ১৭৪৩ সালে রাশিয়ার জারেদের দখলে চলে যায়। তবে ১৮১২ সালে দুর্গটি পুনরায় ফিনল্যান্ডের জমিদারি প্রথার অন্তর্ভুক্ত হয়।

ছোট্ট এই শহরটিতে রয়েছে বেশ কিছু নামী স্কুল। এর জন্যেও শহরটির গৌরব কিছু কম নয়। কাঠ, কাঠজাত দ্রব্য ও জাহাজ তৈরির কেন্দ্র হিসেবেও স্যাভোনলিনা বেশ পরিচিত। এই শহরটির আন্তর্জাতিক পরিচিতি বোধহয় পুরোপুরি সংস্কৃতির দিক থেকে। প্রতি বছর জুলাই মাসে এখানে বসে বিখ্যাত 'স্যাভোনলিনা অপেরা ফেস্টিভ্যাল'। এক মাস ব্যাপী এই উৎসবে দেশ-বিদেশের বিখ্যাত অপেরা গাইয়েরা যোগ দেন। ওলাভিনলিনা দুর্গের প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়ে তাঁরা তাঁদের গান পরিবেশন করেন। এই সময় স্যাভোনলিনা দেশ-বিদেশের পর্যটকে গমগম করে। ১৯১২ সাল থেকে এই অপেরা ফেস্টিভ্যাল শুরু হলেও ১৯৬৭ থেকেই এর রমরমা।

৩৫০ বছরের প্রাচীন এই শহরের স্মরণে ফিনল্যান্ড একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। ডাকটিকিটের নকশায় আকাশ থেকে স্যাভোনলিনা শহরকে কেমন দেখায় তারই রূপ ফুটে উঠেছে। মাঝখানে বিখ্যাত ওলাভিনলিনা দুর্গটিকেও দেখা যাচ্ছে।

নতুন বই

জ্যোতিভূষণ চাকী সম্পাদিত
গদ্যে বাল্মীকি রামায়ণ ২৫০.০০

উপন্যাস
নারায়ণ সান্যালের
আর্টিমিসিয়া ৭৫.০০
গৌরী দের
কমেডিয়ানদের কথা ৭০.০০

ভ্রমণ
স্বামী অচ্যুতানন্দের
ভারতের তীর্থে তীর্থে ১০০.০০

ছোটদের
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কঙ্কাল রহস্য ২৬.০০
ডঃ গৌরী দের
রক্তকালীর মাঠ ৪৫.০০
সুভাষ ধরের
নিশিরাতের অভিযান ৩৬.০০
শ্যামল চক্রবর্তীর
বিজ্ঞানের সেরা কারিগর ৫৫.০০
বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
চিড়িয়াখানার মানুষ মা ৫০.০০

অনুবাদ
নতুন বই
জোয়ানা স্পাইরির
হাইডি ৩০.০০
(অনুবাদ—হীরেন চট্টোপাধ্যায়)
রবার্ট লুই স্টিভেনসন ১২০.০০
(৬টি বই একত্রে)
❑ ডাঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড ❑ কিডন্যাপড্ ❑ দি বটল ইম্প ❑ ট্রেজার আইল্যান্ড ❑ ব্ল্যাক অ্যারো ❑ ক্যাট্রিওনা
স্যার ওয়ালটার স্কট ৮০.০০
(৪টি বই একত্রে)
❑ আইভ্যানহো ❑ দ্য ট্যালিসম্যান ❑ রবরয় ❑ দ্য ফেয়ার মেইড অফ পার্থ
এরিক মেরায়া রেমার্ক ৫০.০০
(২টি বই একত্রে)
❑ অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট ❑ দ্য ব্ল্যাক অবিলিস্ক
স্যার হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
(২টি বই একত্রে) ৫০.০০
❑ কিং সলোমনস মাইনস ❑ মুন অব ইজরায়েল
এডগার ওয়ালেস ৫০.০০
(২টি বই একত্রে)
❑ দ্য ফোর জাস্ট মেন ❑ দ্য ট্রেইটার্স গেট

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের
বই ব্যবসা ও পাঁচ পুরুষের বাঙালী পরিবার ১০০.০০

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন ❑ কলকাতা-৯

বিচ্চুর
জাদুশক্তি
জুরান নাথ
কিরে! সবাইকে আসতে বলেছিস। কী ব্যাপার?
বলছিলাম, আমাদের একটা ক্লাব হলে কেমন হয়?
সেতো খুব ভালো। কিন্তু ঘর পাবি কোথায়?
!!
ঘর আমি দেখেছি। কাঁঠাল বাগানের ভিতরে একটা ভাঙা বাড়ি আছে!
ওরেব্বাবা! না— ওতো শুনেছি ভূতের বাড়ি!
!
বাজে কথা বলিস না তো! ভূত-টুত সব বোগাস্!
তাই বলে পোড়ো বাড়িতে!
সেকিরে! তুইও ওর দলে?
ও একটু গোছ-গাছ করে নিলেই হবে। কিরে?
সেইমতো—
!!?
চল, এবার ঝুড়ি কোদাল নিয়ে লেগে পড়।
কিন্তু—
ঐ আঁবার কাঁরা এঁল গোঁ গুঁরুদেব? এঁসেই জঁঙ্গল সাঁফ কঁরতে লেঁগেছে?
চ্যাঁলারে— এঁ নির্ঘাত আঁমাদের উঁচ্ছেদ কঁরবার জঁন্যই এঁসেছে!
এদিকটা হয়েগেলে পেছনদিকটাও পরিষ্কার করতে হবে।
কঁরাচ্ছি!
এঁই নেঁ!
!!??
ঠকাস্!

ইর-র-র-ক্! খুলি! ভু-ভু-
আগেই বলেছিলুম!
ভয় পাস না। নিশ্চয় কেউ মজা করছে!
ওঁ গুরু! খুলি দেখেও তো ভঁয় পেঁল না! এঁবার কিঁ?
ভঁয় পাঁবে নাঁ মাঁনে? এঁমন নেঁত্য দেঁখাব যেঁ পাঁলাবার পঁথ পাঁবে নাঁ।
ওরে বাবা! বিচ্ছু! আমরা ভূতের হাতে পড়েছি!
এঁইবাঁর দেঁখ! কেঁমন ভিরমি খাঁয়!
আঁ-আঁ-
কীঁ ব্যাঁপাঁর! এঁখনও দাঁড়িয়ে! ভূঁতের নেঁত্য দেঁখার ইচ্ছে হঁয়েছে বুঁঝি?
অঁত কঁথায় কাঁজ কিঁ গুঁরু! এঁকবার নেঁত্য দেঁখিয়েই দাঁও নাঁ!
গেছি!
নাচ দেখাবার খুব ইচ্ছে বুঝি? বেশ, তবে নাচতেই থাকো।
!!
!?
বিচ্ছুর জাদু-
ওঁ গুঁরুদেব! এঁ তো ভাঁরতনাঁট্যম! ওঁদের ভূঁতের নেঁত্য দেঁখাও?
!?
আঁমি কিঁ ইচ্ছে কঁরে নাঁচছি নাঁকি! এঁমনিতেই হাঁত-পাঁ চঁলছে যেঁ!
ওঁ চ্যাঁলা! আঁমাকে থাঁমা নাঁ! হাঁত-পাঁ ছিঁড়ে যাঁবে যেঁ!
আঁমি কিঁ কঁরব গুঁরু! আঁমিও যেঁ নাঁচছি!
গুঁরুদেব! ব্যাঁপার ভাঁলো নঁয়! নাঁচতে নাঁচতে হঁড়কে পঁড়াই ভাঁলো!
টা-টা!
সেঁ আঁর বঁলতে!
হা, হা!! ওরা পালিয়েছে। আশা-করি এদিকে আর আসবে না।
বেঁচেছি!

মজার পাতা

নতুন শব্দমালা

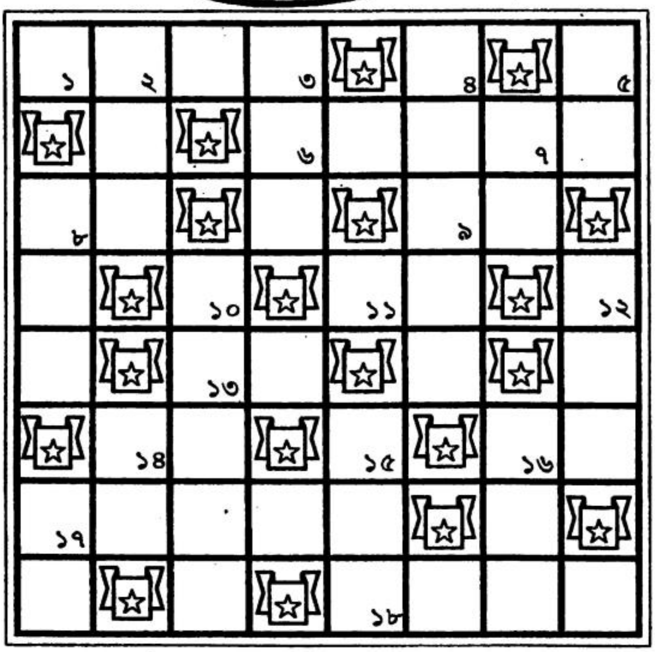

এটি তৈরি করেছেন সুব্রত দেব, চন্দননগর, হুগলি।

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১। মুসলমানী প্রথায় অভিবাদন ৬। ব্যঙ্গে উপবাস ৮। শরতের প্রতীক ৯। প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ১১। এটির থেকে চুন খসলেই বিপদ ১৩। মাথাতেও আছে আবার চরকাতেও আছে ১৪। ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ১৬। পৃথিবী ১৭। যা মান্য করা সকল নাগরিকের কর্তব্য ১৮। জাতীয় দলের উদীয়মান পেসার

উপর-নীচ ঃ ২। মিষ্টি খবর ৩। ভূ-সম্পত্তির অংশ ৪। যুদ্ধের আগুন ৫। শিব ৭। অম্লরসযুক্ত হওয়া ৮। —— তুমি ভুলিবে কি পথ ১০। পরিপাটি সাজগোজ করা নারী ১২। বৈশাখের এই দিনেই দোকানে দোকানে হালখাতা ১৪। সংক্ষেপে নম্বর ১৫। জুতো বা খড়ম ১৬। হঠাৎ করে চাকরিতে না দেওয়াই ভালো ১৭। এই মিল ব্যাকরণে

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার নতুন শব্দমালার উত্তর ঃ

পাশাপাশি ঃ ১.অজগর ৪. দিবস ৭. প্রগতি ৯. নত ১০. সৎ ১১. সরস ১৪. মনন ১৫. মালা ১৬. চাকা ১৮. সুনজর ২০. বেত ২১. গাব ২২. চলন্তিকা ২৪. বিনতা ২৫. রবি

উপর-নীচ ঃ ১. অপ্রসন্ন ২. জগৎ ৩. গতি ৫. বন ৬. সতত ৮. করমচা ১২. সনকা ১৩. সলাজ ১৫. মানব ১৭. হাত ১৮. সুগার ১৯. রচন ২০. বেকার ২৩. লতা

এ মাসের প্রশ্ন

এই ছবিটি এক সুইডিস রসায়নবিজ্ঞানীর যিনি প্রবর্তন করেন বিভিন্ন মৌলের আধুনিক রাসায়নিক চিহ্ন(Symbol); যেমন কার্বন - C, আয়রন-Fe , গোল্ড-Au ।

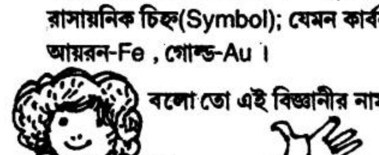

বলো তো এই বিজ্ঞানীর নাম কী ?

জেনে রাখো

এই প্রসঙ্গে মজার ব্যাপার হল এক সময় প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীক জ্যোতির্বিদগণ ধাতুর সহিত বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের সাদৃশ্য কল্পনা করে বিভিন্ন ধাতুর প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করতেন!

যেমন আয়রন- ♂ (মঙ্গল), গোল্ড- ☉ (সূর্য)

মজার পাতা

নতুন ধাঁধা

১. সংখ্যার পর সংখ্যা দিলে
দেবতার অর্থ মিলে।

তারাপদ বটব্যাল
অমরকানন/বাঁকুড়া

২. বয়ে যেতে বলো
ভিতরে শব্দ পাবে
সবটা এক প্রাণী
তিন অক্ষরে হবে।

সজল ও অপু গুহ
শেওড়াফুলি/হুগলি

৩. শেষে কভু হ্যাঁ নয়
ভালোবাসা আগে রয়
সবে মিলে চিন্তারাশি
জানিও নিশ্চয়।

অভিষেক ও অনামিকা দাস
ব্যারাকপুর/উঃ ২৪ পরগনা

৪. প্রথমে দেখায় গদ
ইঙ্গ পুতুল
পরেতে উদর দেখায়
ধাঁধাটি অতুল।

চয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
কোলাঘাট/পূঃ মেদিনীপুর

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তর ঃ
১. কাতলা ২. গজল ৩. সহসা ৪. বামন

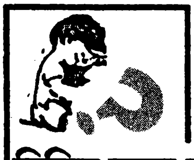

বিকির নতুন মজা

কোন পথে গেলে সহজেই পাওয়া যাবে লোভনীয় খাবার?

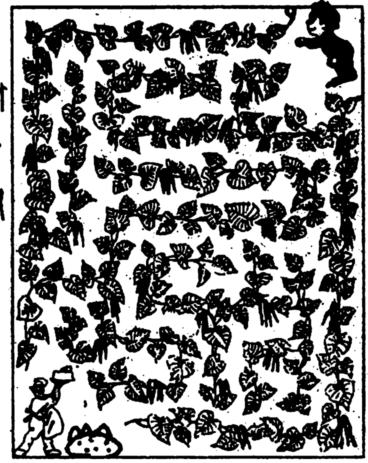

ফুটকি থেকে ফুটকি যোগ করে সুন্দর একটা ছবি বানাও

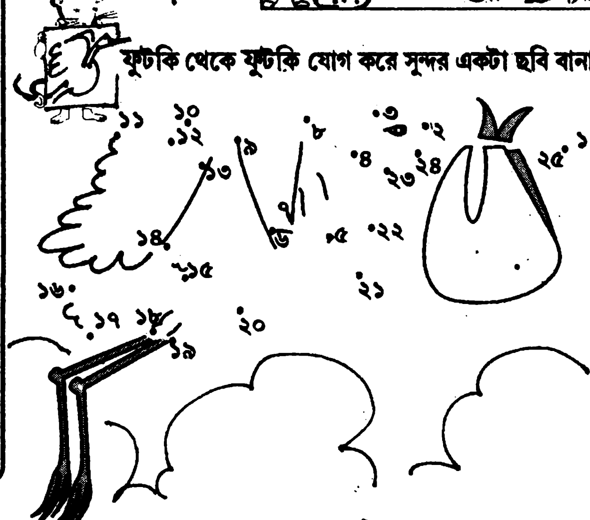

১নং ও ২নং ছবি দুটি একই রকম দেখতে হলেও ১নং ছবিতে ২নং ছবির বেশ কিছু অংশ নেই! কমপক্ষে ৬টি অংশ বের করো!

উত্তর ________________

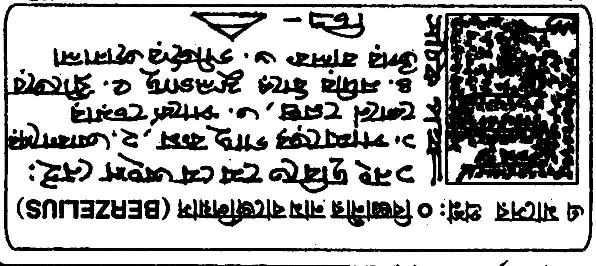

চটপট বলো পরের চিত্রটি কী হওয়া উচিত?

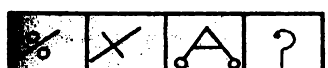

সঠিক চিত্রে দাগ দাও!

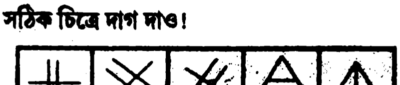

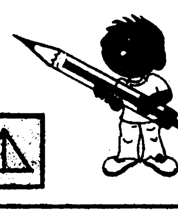

চৈত্র সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম ঃ

।। **কলকাতা**।। ধ্রুব, সংযুক্তা, বিনোদ ও মা/শাঁখারী পাড়া রোড, কল-২৫; সিন্ধু, রুনা, রিফাত, মুসাররাত, কানিজ, ঝুমা, নাসিমা, সীমা, বুম্বা, শাহনাজ, কিরণ, আলহাতুল, সম্রাট, সোহেল, জোজো, তারশিদ, রোশাইদ, মুসতারশিদ, লম্বু, শহবাজ, তৌকের, আব্বা, মা, চাচু ও চাচিমা/এম. এম. আলি রোড, খিদিরপুর, কল-২৩; তাপস, রত্না, সোমা, অভয়, পূবালী ও শৌভিক/অটল বিহারী বসু লেন, কল-১১; সম্রাজ্ঞী, রাজেশ্বরী ও ঐশ্বর্য রায়/মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট, কল-৬; সৌম্যদীপ ও দেবলীনা বিশ্বাস/ঠাকুরপুকুর, জোকা, কল-১০৪; পীযূষ, নিবেদিতা ও স্বর্ণকমল তপস্বী/পশ্চিম নিশিন্তপুর, বোড়াল, কল-১৫৪; বাণীকণ্ঠ, শুক্লা, শুভদীপ, নবনীতা, রূপপর্ণা, দেবকণ্ঠ, সুনন্দা, ঋতুপর্ণা, শ্রেয়পর্ণা, চুনী, কবিতা, অনির্বাণ, রুনা, রকি ও দেবানিকা/পি. জি. এইচ. শাহ রোড, যাদবপুর, কল-৩২; অরুণিমা ও শীলা মণ্ডল/পাটুলী, কল-৯৪; পবিত্র, করবী, পিয়ালী, শিখা, দীপালী, আশিস, সৌম্যশুভ্র নন্দী ও সুরজিৎ বসাক/অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন, বেলেঘাটা, কল-১০; মা, বাবা, বুবুন, বাবাই, গিনি, ঝিঙ্কু ও বাবুজী/রিজেন্ট এস্টেট, কল-৯২; দীপায়ন, সুস্মিতা ও গৌতম সেন, বিশু ও বাণী গুপ্তা/সাউথ এন্ড পার্ক, কল-২৯;

।। **২৪ পরগনা (উঃ/দঃ)**।। সুজয়, সাধনা ও শুভদীপ চক্রবর্তী/ইলিয়াস রোড, আগরপাড়া (উঃ); নমিতা, নীলাঞ্জন, নীলোৎপল ও উৎপল দত্ত/খাঁটুরা, গোবরডাঙা (উঃ); আভাস, ইরা ও অনুরীতা রায়/নোনাচন্দনপুকুর (উঃ); বড়মাসি; বড়মেসো, মেজমাসি, মেজোমেসো, ফুলমাসি, ফুলমেসো, ন'মাসি, ন'মেসো, ছোটমাসি, ছোটমেসো, সেজমাসি ও ইয়া/এন. এল. টি. রোড (উঃ); অতীন গুহঠাকুরতা, রবীন্দ্র সরণি, নবব্যারাকপুর (উঃ); চন্দ্রমৌলী, সিদ্ধার্থ, অনুরাধা, তাপসী, সুমিত্রা, সুস্মিতা, সুতপা, সুচিত্রা, সুজাতা, সুব্রতা ও সুলতা ভট্টাচার্য/এন. এল. টি. রোড, ভাটপাড়া (উঃ); রিনি, রাহুল, বিদিশা মিত্র ও ইন্দ্রজিৎ গাঙ্গুলী/মণ্ডলগাঁথি, বামনগাছি (উঃ);

।। **হাওড়া**।। ঋজু ও রিয়া দাশগুপ্ত/সাঁকরাইল; পৌলমী, সুকন্যা, সপ্তর্ষি, গোরা, বুলু, শর্বরী, দেবী, স্বপ্না, রত্না, টুটু, বাবলি, দিমমা ও বাপী/হালদার পাড়া, শিবপুর; সৌম, সৌরভ ও সোনালি ব্যানার্জী/বি. বি. হালদার লেন, শিবপুর; বুম্বা ও ডোরা মুখার্জী/বি. বি. হালদার লেন, শিবপুর; মীরা, বিমান, রীতা, সব্যসাচী, অর্চিতা ও শতাব্দী মুখার্জী/গণেশ চ্যাটার্জী লেন, শিবপুর; প্রদীপ ও অপর্ণা বসু/দেবনাথ ব্যানার্জী লেন; দিশা, দোদো পুকান ও তুহিন কুমার গুপ্ত/নবকুমার নন্দী লেন, চৌধুরি বাগান; বিদিশা মজুমদার/কিউ রোড, বেলগাছিয়া, হাওড়া;

।। **হুগলি** ।। শময়িতা ও সৃজিতা সরকার/কোন্নগর; শুভঙ্কর ও কেশব ঘোষ/ভোঁপুর; বিভাসিতা দত্ত/পল্লীশ্রী, আরামবাগ; দিগন্ত, বিজলী ও আশিস কোলে/বড়সরসা, ইটাদুনা; পায়েল, গীতা, সজল ও মীরা ব্যানার্জী/ময়নাডাঙ্গা, চুঁচুড়া আর আস; মৌক্তি, স্বাতী, অপর্ণা, সুকুমার, বিজয়, অরিন্দম, বলরাম, চিত্রা, মামণি, রমা ও অলি/জমিদার রোড, শেওড়াফুলি; দেবাশিস, স্নেহাশিস, রিঙ্কু, বর্ণালী ও দিয়া চ্যাটার্জী/শ্রীরামপুর; উপমন্যু দে ও শ্রাবণী দে/রিষড়া রামকৃষ্ণ রোড, মাহেশ; ডোডো, রনি, পিউ, মুনি ও টিটু/রিষড়া রামকৃষ্ণ রোড, মাহেশ;

।। **বর্ধমান**।। সোহিনী ও শৌভিক ঘোষ/রানীগঞ্জ স্কুলপাড়া; টুইংকল, রুবাই, টুয়া ও টুবাই/মানকর পূর্বাশা; শৌনক ও সঞ্জীব কুমার/অমরারগড়; হানি, টনি, চমকি, লাকি, রাজ, ঋক ও সৌভাগ্য/ লছমনপুর, সালানপুর; শতভিষা, যশোধারা, বাসবী ও ডাঃ উত্তম কুমার বটব্যাল/উর্বী আর্যাবর্ত, দুর্গাপুর; আরতি, নোয়েল ও প্রতীক দাশগুপ্ত/হিরাপুর দক্ষিণপাড়া, বার্নপুর; প্রণব, গীতা ও সৌম্য দাশগুপ্ত, আশিস, চিত্রলেখা ও অংকন দাশগুপ্ত/বহালপাড়া, কুলটি; তিস্তা, সুমন, বাবুয়া, জোনাকি, রাত্রি, গোপাল, তুতুন, অমরনাথ, কাশীনাথ ও সেবা/শান্তিনগর, বার্নপুর; অরিন্দম সূপকার, মা ও বাবা/রাস্তা নং-৩১, চিত্তরঞ্জন; সমীর, মুকুল ও বিদিশা গুপ্ত/নাগার্জুন রোড, বি-জোন, দুর্গাপুর; অচিন্ত্য, কাবেরী ও অনঘ ঘোষ/সুভদ্রা টাওয়ার, আসানসোল; মা, প্রদীপ, বিশ্বজিৎ, অভিজিৎ, পিয়া ও আলো সেনগুপ্ত/হীরাপুর, রিভার সাইড রোড, বার্নপুর; মা, বাবা, বুনু, জেঠু ও জেমমা/ডি. পি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর; দিয়া, রুম্পা, প্রতিমা, শিল্পী, লালী, মুন্না, চিন্টু, বুবু, বুবা ও সিজার/আড্ডা কলোনি, দক্ষিণ ধাদকা, আসানসোল; সাধনা, সমু, সনু, অনিতা ও সন্দীপ/শ্যামপুর কলোনি, দুর্গাপুর; দাদু, দিয়া, তিন্নি, শুক্লা ও কুন্তলা/আমবাগান, বার্নপুর; মা, বাবা, অভীক ও অন্তরা বাউরী/ভগৎসিং মার্গ, সি-জোন, দুর্গাপুর; সুমেধা, দেবশ্রুতি, সুশ্বেতা, ঋতুপর্ণ ও অভিষেক/বার্নপুর; সৌমাভ ও সৈকত/রঘুনাথপল্লী; আসানসোল;

।। **পুরুলিয়া**।। শিবাশিস ও শঙ্কর প্রসাদ ঘোষ/রাঁচী রোড; পাপাই, অনির্বাণ, সায়ন, আবুল, আমিন ও সুম্মা/সাঁওতালদি থার্মাল কলোনি; রুদেন্দ্র, হৈমন্তী, গোল্ডি ও গুড্ডু রায়/আদরা রেলওয়ে কোয়ার্টার;

।। **বাঁকুড়া** ।। অর্ণব, অভিজিৎ, সায়ন্তন, সৌরভ ও স্মিতা মুখার্জী/অর্ধগ্রাম; ইন্দ্রনীল রায়/মেজিয়া হাইস্কুল পাড়া; শুভ্রাংশু, সুধাংশু, হিমাংশু, সিতাংশু, সৌরাংশু ও স্নেহাংশু/মটুকবনী; দেবলীনা, বুনু ও গুড্ডি/মনসাতলা, বিষ্ণুপুর; অশোক, লাবণ্য, পায়েল ও অয়ন দাস/ দোলতলা; সুভাষ আটা, বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলী, দেবদাস চ্যাটার্জী, সমীর ও দিলীপ মণ্ডল/বাঁকুড়া; অরূপ, বয়লাল, ঝর্ণা, বুলা, অলিভিয়া, ঋতুজা ও বাবু/তিলুড়ী, সালতোড়া; বলু, লাবু, মুন্নি ও পাপুন/নাজির বান্দ পাড়া; সৌমিত্র, সন্দীপ, সুদীপ, রানা ও সোনা/মটুকবনী; দেবকী রঞ্জন বিশ্বাস ও অরূপ কুমার দাস/আইস বাজার, বিষ্ণুপুর; মা, বাবা, ভাই, উত্তরা ও অপ্সরা বাউরী/কেচকা, মটুকবনী; আশামুকুল ও বেলা রায়/ বৈতাল, উত্তরবাড়; বৈদ্যনাথ, কৃষ্ণা, দেবলীনা ও ইন্দ্রনাথ রায়/শালবাগান, বিষ্ণুপুর; সোমনাথ, মণিদীপা, ওসিন ও রিমো রায়/ ঝাঁপড় মোড়, বিষ্ণুপুর; কার্তিক, সন্ধ্যা ও চিক ঘোষ/শালবাগান, বিষ্ণুপুর; বাবা, মা, সঞ্চিতা, অন্বেষা ও সুব্রত নায়েক/মটুকবনী; রাধানাথ, সুস্মিতা, পঙ্কজ, পম্পা, রিম্পা, তিয়াশা ও স্বরূপ/বেলুট; সুমি ও দনু চক্রবর্তী/চাঁচর-বাঁকাদহ;

।। **মেদিনীপুর (পঃ/পূঃ)**।। ইন্দ্রনাথ ও অনিন্দিতা মাল/পাটনা বাজার; অনন্যা, রাজর্ষি ও সুস্মিতা বসু/কে. টি. পি. পি টাউনশিপ (পূঃ); শ্রীলেখা, মনিকা, সুপ্তি, স্বর্ণেন্দু, দীপ্তি ও নিমাই নায়ক/গড়বেতা (পঃ); বাবা, মা ও সর্বাশিস হোতা/ঝাড়গ্রাম (পঃ); পম্পি, সৌমিমন, গোপলু, কুহু, জেরিনা ও পুষ্পরেণু দত্ত/মহিষাদল (পূঃ); নন্দলাল, কল্লোল, কৌস্তভ, রাজু, বিজু, কুণ্ডল, টাটাবাবু, বাপন, রক্তিম ও পিসি মণি, শালিকোঠা (পঃ); শিবানন্দ, সুমন, নিবেদিতা ও সঙ্গীতা বেরা/ মেনকাপুর (পঃ); রত্না, সমীর, শিল্পী, শতাব্দী, প্রতিমা ও প্রবীর/সাউটিয়া (পঃ); চন্দন, দেবত্রি, বিল্কু, ছবি ও অর্চনা/শেখপুরা চার্চরোড (পঃ)

।। **বীরভূম** ।। পিয়ালী, মানোয়ারা, জিশান, রুনি, ঝুমি, ডল, শুভ, নাসিম, পায়েল ও রিয়া/পলাশী (পাঁরুই); ধীরেন চ্যাটার্জী/আহমদপুর; পিকু, গুড্ডু, বাবা, মা, জেঠু, ঠাম্মা ও বড়মণি সিনহা/আহমদপুর; অনিল সরকার, সুনীল রায়, রঞ্জু, ভোঁদর, রাকেশ ঘোষ, অরবিন্দ রায়, মলয় পাল, প্রদীপ ব্যানার্জী, হীরা গুপ্তা, রামপ্রসাদ সাহা, মলয় দাস, বাবুলাল, মঞ্জু ও চিন্ময় রায়/সিউড়ি রোড, সাঁইথিয়া; তুনীর বিশ্বাস, অর্ঘ্য বিশ্বাস ও পায়েল সরকার/বিবেকানন্দ পল্লী, সাঁইথিয়া; দাদিয়া, ঠাম্মু, মা, বাবা, গোগোল, দিশা, সুপ্রিয়া ও সান্ত্বনা/আহমদপুর; তিতাস, মেঘনা, শঙ্খ ও তিস্তা সাহা/পুরন্দরপুর; অচেতন ও সচেতন জানা/ মুরারই; নাতাশা, রন্ঝা ও মেহেলাজ/গুরুপল্লী, শান্তিনিকেতন; সাবা, সাহেল, জন্টি ও রাজা/ফতেপুর; বেলুটি;

।। **মুর্শিদাবাদ** ।। অরুণ, সঙ্গীতা, দেবদ্যুতি ও দূর্বাদল দাস/এ. সি. রোড (পূর্ব), খাগড়া; পর্ণ, পিউ ও মৌলী গুপ্ত/রঘুনাথগঞ্জ, শ্রীঅরবিন্দ পল্লী; নৌরীন ফেরদৌস, ফেরদৌসী, জেবুন্নেসা ও নজুলা খানম/বাণীনাথপুর, সারগাছি (আশ্রম); সফিকুল ইসলম, শিরীন সুলতানা ও শাখাওয়াত হোসেন/চর-কাতিলপুর, সাগরদীঘি;

।। **জলপাইগুড়ি**।। কৃষ্ণপদ, দেবাশিস, গৌরব, ইন্দ্রনীল, প্রতিমা, শিল্পী, লালিয়া, চৈতালি, দেবাংশি, দুষ্টু ও মিষ্টি/পিলখানা গভঃ হাউসিং, রেসকোর্স পাড়া; সমর ও বুলা দে/ইঞ্জিনিয়ারিং কলোনি; আলিপুর দুয়ার জংশন;

।। **নদীয়া** ।। বিমল বর্মন/ডাকবাংলা, কৃষ্ণনগর; সায়ন গুপ্ত/দেবগ্রাম;

।। **ঝাড়খণ্ড** ।। নিরঞ্জন, জ্ঞানরঞ্জন, সত্যরঞ্জন, রুবেন, শুভেন, বুবুন, তনুশ্রী, বনশ্রী, জয়শ্রী, চুমকি ও রিচিক কর গুপ্ত/জামেশদপুর; নন্দিনী ও তুহিন কোনার/হীরাপুর, ধানবাদ; শেলী, বুলি, বনা, টাবু, ইভা, সোমা, টিটো, ডন, বাবলা, সোনামণি, শুভম, রুমি ও রূপ সেনগুপ্ত/বাগুন নগর, বারিডি, জামশেদপুর; মোহনা, বুবকা, বাবা ও মা/আই. এস. এম ধানবাদ; প্রবীর, রমা, প্রিয়াঙ্কা ও প্রিয়ালী বিবাড়/ রেল কলোনি, বোকারো স্টিল সিটি; মা ও সন্দীপ/প্রমথ নগর, জামশেদপুর; সন্দীপ সেন ও বিপ্লব রায়/কে. বি. কমিউনিকেশন, সুন্দর নগর, জামশেদপুর; সন্দীপ, সীমা, শান্তু, তিন্নি ও শীলা সেন/নির্মল অ্যাপার্টমেন্ট, প্রথম নগর মেন রোড, জামশেদপুর; বাবু, মৌ, মিঠু, গদাই, অর্ক, বিনায়ক, বিদ্যুৎ, টিয়া, অমিতাভ, গৌতম ও গুড্ডু/বাবুলাইন, মৌভাণ্ডার, পূর্ব সিংভূম;

।। **অসম** ।। লেখা চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী, সাধন, ছন্দা ও সৌরভ ব্যানার্জী/পানবাজার, লক্ষ্মী চ্যাটার্জী লেন, গৌহাটি; ঋতা চন্দ, অর্কদীপ ও দেবব্রত শীল/ব্লক রোড, লক্ষ্মীশহর, হাইলাকান্দি;

।। **কর্ণাটক** ।। সুপর্ণকান্তি দাশ/ডি. আর. ডি. ও, বাঙ্গালোর।

ভূতের দেখা

মানস সরকার

কাজের শেষে গভীর রাতে
ফিরতি পথে একা
মামদো ভূতের পুতের সাথে
হঠাৎ সেদিন দেখা!
নাকি গলায় গাছের তলায়
বলল, 'খোকা দাঁড়া!'
বুক উড়ে যায় শুনেই আমার—
দেব কি ভাই সাড়া।
গা কন্‌কন্ মাথা ঝন্‌ঝন্,
ধপাস্ করে পড়ি!
চেঁচিয়ে গলার শির ফুলে যায়
পাড়া মাথায় করি।
যায় কেটে ভয় চোখ খুলতেই
মুখেতে চুন কালি
ফিকফিকিয়ে হাসছে দেখি
বন্ধুর বোন মলি।

ভূত-পরিবার

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

চুল খোঁচা নাক বোঁচা,
ভূত-খোকা খুবছোঁচা
খায় আলু-কাবলি,
দাঁত মুলো কান কুলো,
খেয়ে বুঝি হাত ধুলো
দেখেছে তা বাবলি!

হাড় গিলে, সার পিলে,
ভূত-খুকি, কোথা ছিলে?
খিদে পেলে কুছ খাও,
নেই জুড়ি ভেলপুরি
হেসে বলে পাকা বুড়ি—
খেতে পারি ফুচকাও!

রিনিঝিনি তাকে চিনি,
ভূত-মাতা এই ইনি
ভালোবাসে চাটনি,
শিরে বাজ কত কাজ
চুরি করে আনে মাছ
দিনভর খাটনি!

মুখে দাড়ি রাশভারি
ভূত-পিতা নেই বাড়ি
গেছে কাজে সালকে,
চুলে জটা তার কথা
বলা যাবে করে ঘটা—
আজ নয়, কালকে!

ভূতের ফাঁদে

নারায়ণ চন্দ্র দাস

ভূতের ফাঁদে ধরা পড়ে
বললে কেঁদে কেনারাম,
মরে গিয়ে আছি বেঁচে
বাজারে আজ হাফ দাম।
সত্যি বলছি আমি অতি
গরীব মৎস্যজীবী,
হঠাৎ করে দেহের ভিতর
ধরল যে বোন টি-বি!
ভূত বলে, বা, বেশ তো আছিস,
টনটনে তোর জ্ঞান তো,
মরা হয়ে কেমন করে
ধরিস রে মাছ জ্যান্ত?
ছাড়া তোকে যাবেই না রে
মাছ তো ধরিস ফোকটাই,
একা খাবো, একা পড়বো
বহাল আছে রোগটাই।
বলছি যা তা শুনে যা রে
যদি থাকে প্রাণে ভয়,
নইলে কিন্তু ঘাড় মটকে
ঠিক পাঠাবো যমালয়।
চট করে তুই আয় নিয়ে
ইলিশ কয়েক জোড়া,
কেউ যেন না জানতে পারে
বুঝলি রে মুখপোড়া?

লাগ ভেল্কি

বিমল মৈত্র

ওল্টানো মুখ, ওল্টানো বুক,
ওল্টানো হাত-পা;
মাথার ভারে হেঁটে বেড়ায়
মামদো ভূতের ছা।
তাই না দেখে বললো হেঁকে
শাঁকচুন্নির পুত,
'হ্যাঁরে মামদো, তোর দেহেতে
এমন কেন খুঁত?'
'খুঁত কী বলিস্? আজ দুনিয়ায়
খুঁত বোঝা কি সোজা?
উল্টো সোজা অনেক কিছুই
যায় নাকি আজ বোঝা?
চলচ্চিত্রে চান্স পেয়েছি,
লাগিয়ে দেব তাক;
লাগ ভেল্কি, লাগ ভেল্কি,
টাক্ ডুমাডুম্ টাক্!!'

ছবি ঃ বিজন কর্মকার

এক ঐতিহাসিক প্রেতাত্মা

আদিত্য বোস

এখন আমি এক উননব্বই বছরের বৃদ্ধ। কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়েছি দীর্ঘদিন হল। ছেলেদের সংসারে থেকে সারাদিন ঠাকুর-দেবতার নাম করি। বিকেলবেলা কোনো-কোনো দিন ছড়ি হাতে ইটখোলার মাঠে যাই। সেখানে সমবয়সী আরও কিছু বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। ধর্ম থেকে রাজনীতি, সব বিষয়েই তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়।

সেদিন বসে আড্ডা দিতে-দিতে কখন সন্ধ্যা হয়েছে খেয়াল নেই। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি শুরু হতে খেয়াল হল অনেকক্ষণ আঁধার নেমেছে। বাড়ি ফেরার জন্য সবাই উঠে দাঁড়াতেই, কালীপদ বাধা দিল। সে বলল, বাড়ি ফেরার পথেই তুমুল বৃষ্টি নামবে, ফলে ভিজতেই হবে। তার চেয়ে তার বাড়িতে সবাই চলুক। যতক্ষণ না সম্পূর্ণ বৃষ্টি থামে, ততক্ষণ তার বাড়িতেই আড্ডা জমুক। এই প্রস্তাবে সকলেই রাজি হলাম। ইটখোলার মাঠের লাগোয়া কালীপদর বিশাল বাড়ি। সেখানেই শুরু হল জমাটি আড্ডা। নানা গল্প হতে-হতে, ভূতের প্রসঙ্গ চলে এল। এই বিষয়ে সবাই নিজের নিজের অভিজ্ঞতা বলল। ওদিকে কালীপদর কথা মেনে নিয়েই যেন বাইরে তুমুল বৃষ্টি শুরু হল। আমি চুপ করে বাকিদের কথা শুনছিলাম এমন সময় বলরামবাবু বললেন, আপনার অভিজ্ঞতা কিছু বলুন। আপনি তো নানা জায়গায় ঘুরেছেন। আপনার কোনো অভিজ্ঞতা....

আমি বললাম, এখনও পর্যন্ত একটা অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছে। সে এক অলৌকিক ঐতিহাসিক ঘটনা। ঐতিহাসিক কেন তা পরে বোঝা যাবে। বেশ একটু গুছিয়ে নিয়ে শুরু করলামঃ সেটা উনিশশো চল্লিশ সাল। ইংরাজ সাম্রাজ্য তখন প্রায় অস্তাচলে। স্বাধীনতা লাভের জন্য দেশ তখন মরিয়া। সরকারি ডাক্তার হিসাবে বাংলার নানা রোগপীড়িত স্থানে আমার ডাক পড়ে। বাংলার দরিদ্র সাধারণ

মানুষের সেবা করতে খুবই ভাল লাগত। সেবার গিয়েছিলাম নাটোর জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম শামুকপোঁতায়। তখন সেখানে ভীষণ ম্যালেরিয়ার উপদ্রব। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র নিয়ে সেখানে হাজির হলাম। গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে থেকে রোগীদের চিকিৎসা শুরু করলাম। গাঁয়ের অবস্থা দেখে বুঝলাম বেশ কিছুদিন থাকতে হবে এখানে।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানকার স্থানীয় এক কবিরাজ রাধেশ্যাম বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা হল এবং দারুণ বন্ধুত্বও হয়ে গেল। চিকিৎসা-সংক্রান্ত নানা কথা আমরা আলোচনা করতাম। ওনার সঙ্গেই একদিন স্থানীয় কিছু ঐতিহাসিক স্থান দেখে এলাম। নবাবী আমলে নাটোরের মহারানী ভবানী প্রতিষ্ঠিত রাধাবিনোদ মন্দির আর কিছু ভাঙা দেউল। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির নানা মূর্তি খোদাই করা। চোখ ফেরানো যায় না সেসব দেখে। তবে কালের প্রবাহে সেসব প্রায় ধ্বংসের পথে। ফেরার সময় রাধেশ্যামবাবু বললেন, আরও একটা জিনিস এখানে দেখার আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী জিনিস বলুন তো? উনি বললেন, সিরাজুদ্দৌলার ভূত। আমি হেসে উঠলাম, ভূত! তাও আবার সিরাজুদ্দৌলার! বিশ্বাস করেন এসব গাঁজাখুরি কথায়! তিনি বলে উঠলেন, আলবাৎ করি। নিজের চোখে দেখেছি মশাই। আপনাকেও দেখাতে পারি। প্রতিবছর কোজাগরী পূর্ণিমার দিন, আমাদের গাঁ থেকে যে পাকা সড়ক নবাবগঞ্জে গেছে, সেই পথে সিরাজুদ্দৌলার ভূত ঘোড়ায় চড়ে কোথায় চলে যায়। বহু লোকে দেখেছে। আমার বাপ-ঠাকুর্দারাও দেখেছে। ওনাকে ঐ দিন দেখতে পাওয়া যায়। এই স্বল্পশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হাতুড়ে কবিরাজের কথায় হাসি পেল। ভাবলাম, এই বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে ভূতের কথা স্বপ্নেও ভাবা উচিত না। আদতে ভূত বলে কোনো বস্তুই নেই। এটা একটা কাল্পনিক শব্দ মাত্র। রাধেশ্যামবাবুর পুরোটাই বানানো। হয়তো এইসব বলে মনে মনে

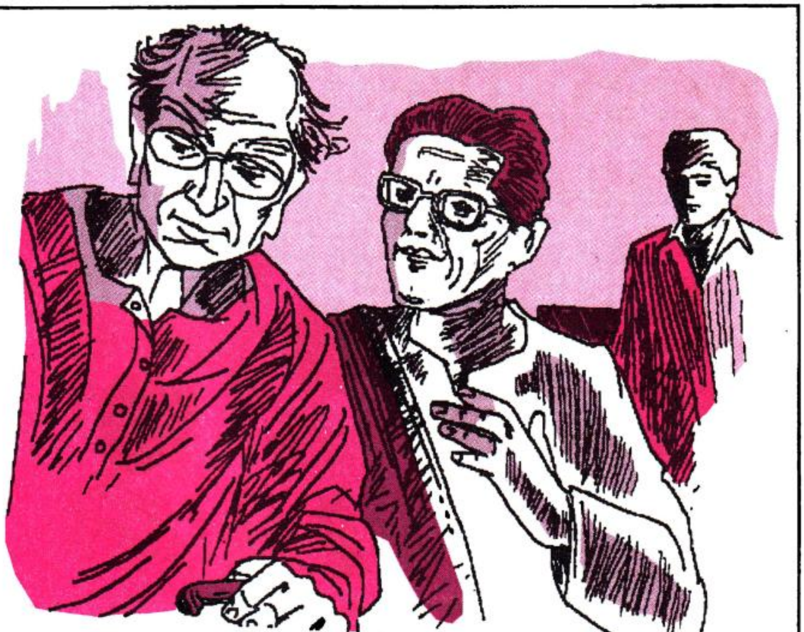

আপনার অভিজ্ঞতা কিছু বলুন

আনন্দ পান। তিনি আমাকে বললেন লক্ষ্মীপুজোর দিন ভূত দেখাবেন। শেষে দেখা যাবে ঐ দিন তিনি কোনোভাবে ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাবেন। মনে-মনে হাসলাম।

কিন্তু সেদিনের কথার পর মাসদুয়েক বাদে রাধেশ্যামবাবু একদিন দুপুরে এসে হাজির হলেন। আমাকে বললেন, কী যাবেন তো? বললাম, কোথায় বলুন তো? হেসে উঠে বললেন, এর মধ্যেই ভুলে গেছেন! সেই বলেছিলাম না সিরজুদ্দৌলার ভূত দেখাব! আমি সম্পূর্ণ ভুলেই গেছিলাম। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, নিশ্চয়ই, আমি তো সেই আশাতেই বসে আছি। এদিকে দু'মাস আপনার দেখা নেই। কাল তো কোজাগরী পূর্ণিমা। নিয়ে যাবেন তো আমাকে?

রাধেশ্যামবাবুর কথা মতন একটা তিন ব্যাটারির টর্চ নিয়ে লক্ষ্মীপুজোর দিন সন্ধ্যাবেলা দুজনে পাকা সড়কের দিকে রওনা দিলাম। বাংলার ঘরে-ঘরে তখন শাঁখ বেজে উঠছে। চঞ্চলা লক্ষ্মী আজ অচঞ্চলা হয়ে ধরা দেবেন। বেশ অনেকটা মেঠো পথ হেঁটে পাকা সড়কে ওঠা গেল। এই পথ নাটোর হয়ে নবাবগঞ্জের দিকে গেছে। এই পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে বাঁয়ে একটা বিশাল আমবাগানের ধারে ঘুপচি মতন জায়গায় আমরা আশ্রয় নিলাম। আমরা দুজনেই রাতের খাওয়া খেয়ে এসেছিলাম। বেশ গুছিয়ে বসার পর হঠাৎ রাধেশ্যাম বলে উঠলেন, ওনাকে কখন দেখা যাবে তার কোনো ঠিক নেই। হয়তো সারা রাতই এই মশার কামড়ে বসে থাকতে হবে। আমি বললাম, রাতজাগা আমার অভ্যাস আছে, কাজেই কোনো অসুবিধাই আমার হবে না। মনে মনে ভাবলাম, তুমি যদি আমাকে রাতজাগা আর মশার কামড়ের ভয় দেখিয়ে এখান থেকে সরাতে চাওয়ার কথা ভেবে থাক, তবে খুব ভুল করেছ। আজই তোমার কথার অসত্যতা আমি প্রমাণ করব।

কতক্ষণ কেটে গেল বসে-বসে। রাধেশ্যামবাবু ঘুমে ঢুলছেন। টর্চটা জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে এগারটা বেজে গেছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। পল্লী প্রকৃতিও এখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ কিন্তু একদম অন্ধকার নেই। কোজাগরী পূর্ণিমা, থালার মতো গোল চাঁদের আলোয় চতুর্দিকে যেন বন্যা হয়েছে। বহু দূরের জিনিসও মোটামুটি চোখে পড়ছে। এক জোড়া সাদা লক্ষ্মী প্যাঁচা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। এমন সময় বহু দূর থেকে যেন খট্‌খট্-

অদূরেই চোখে পড়ল একটা দুধসাদা ঘোড়া

খটাখট্ করে একটা শব্দ কানে এল। শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। রাধেশ্যামবাবুর ঘুম ভেঙে গেছে ঐ শব্দে। তাঁর চোখে-মুখে বিস্ময়। শব্দটা অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। একটা ঘোড়ার ক্ষুরেরই শব্দ। তবে কী রাধেশ্যামবাবুর কথা সত্যি! রাধেশ্যামবাবু মৃদু স্বরে বললেন, খবর্দার...একদম যেন নবাবের সামনে যাবেন না। বলা তো যায় না, যদি ঘাড় মটকে দেন। ওনার কথা শুনে মাথায় একটা খেয়াল এল, ঘোড়াটা ওনার জানাশোনা কারও নয় তো! হয়তো নিজের কথা সত্যি প্রমাণ করার জন্যই এসব সাজিয়েছেন। আমি ঘোড়ার সামনে চলে গেলে ব্যাপারটা বুঝে যাব, এই ভেবেই তিনি আমাকে পথের ওপর উঠতে বারণ করছেন। নির্ঘাৎ তাই! এবার অদূরেই চোখে পড়ল একটা দুধসাদা ঘোড়া। তার উপর একজন সওয়ার। রাধেশ্যামবাবুর কথা না শুনেই পথের ওপর উঠে গেলাম। যাবেন না! যাবেন না! বলে তিনি সম্ভবত ভয়েই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ঘোড়ার আরোহী আমার সামনে এসে সজোরে লাগাম টানলেন। চিঁহি-চিঁহি শব্দ করে সামনে দু'পা তুলে ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ল। এ কী! আশ্চর্য! এ যে অবিকল সিরাজুদ্দৌলা! যেমন ছবিতে দেখেছিলাম —অবিকল সেই রকম। মাথায় রত্নখচিত উষ্ণীষ, পরনে সাদা মখমলের রাজপোশাক—তাতে সোনার জরির কাজ করা। গলায় রত্নহার, কানে কুণ্ডল। হাতভরা আংটি, কোমরেও রত্নখচিত সুবৃহৎ তরবারি। নবাবের শরীর থেকে আসছে শাহী-আতরের খুশবু। হতবাক হয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। নবাব বলে উঠলেন, বত্তমিজ! তুমহে কুর্নিশ করনা ভি নেহি আতা! জানতে হো কিস্‌কে সামনে খড়ে হো তুম্! ম্যয় নবাবে আলম্ সিরাজ-উদ্-দৌলা! হঠ্ যাও সামনে সে.....উল্লু। (বেতমিজ্! তুই কী কুর্নিশ করতেও জানিস না! জানিস কার সামনে দাঁড়িয়ে আছিস তুই! আমি সুবে বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলা। বোকার মতো পথ না আটকে সরে দাঁড়া, উল্লুক!)

হঠাৎ কী ভেবে হাতের টর্চটা সোজা সিরাজের দিকে তুলে জ্বালিয়ে ধরলাম। তীব্র আলো সিরাজের মুখে পড়ল। ক্রুদ্ধ নবাব বলে উঠলেন, বেতমিজ্, বেয়াদপ্। বলেই আমার চোখের সামনে থেকে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আশেপাশে কোথাও তাঁকে দেখতে পেলাম না। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হল রাধেশ্যামবাবুর কথায়। বুঝলাম ইনি সত্যিই সিরাজুদ্দৌলার প্রেতাত্মা। এই প্রেতাত্মা দেখে কিন্তু ভয় পেলাম না। বরঞ্চ বুকটা যেন গর্বে ফুলে উঠল এই ভেবে, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে জীবিত না হোক, তাঁর আত্মাকে দর্শনের মহান সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বুঝি বা আনন্দেই চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। মনে মনে বললাম, হে নবাবে আলম—তোমার সেদিনের অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের পরাজয়ের সেই গ্লানি, আমরা আজও রক্ত দিয়ে শুধছি। তুমি আজ আশীর্বাদ কর যেন এই পরাধীনতার শৃঙ্খল আর আমাদের বেশিদিন আবদ্ধ করে রাখতে না পারে। চোখ মুছে দাঁড়ালাম। আবার নবাবের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ কানে এল। সেই ঘোড়ায় চড়ে বাংলার মৃত নবাব দূরে থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছেন। একসময় সেই শব্দও দিগন্তে মিশে গেল। শুধু আমার চারপাশ সেই নবাবী আতরের সুগন্ধে ভারাক্রান্ত হয়ে রইল বহুক্ষণ।

কিছুদিন পরে নাটোর ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। আসার আগে রাধেশ্যামবাবুকে জড়িয়ে ধরলাম কৃতজ্ঞতায়। তিনিই তো আমাকে এক মহান ঘটনার সাক্ষী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সাত বছর পর দেশ স্বাধীন হল। বাংলা দু'টুকরো হল। নাটোর পড়ল পূর্ব পাকিস্তানে। আর কখনও সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আজও আমার স্মৃতির মণিকোঠায় সেই ঘটনা ভাস্বর হয়ে রয়েছে। আজও হয়তো প্রতি কোজাগরী পূর্ণিমায় বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলার প্রেতাত্মা ঘোড়ায় চেপে সেই পথে ঘুরে বেড়ান। দু'টুকরো বাংলাকে দেখে হয়তো দুঃখে একাকী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি।

আমার বাকি বন্ধুরা সবাই নিশ্চুপ। শুধু কালীপদবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। বাইরে বৃষ্টি তখন থেমে গেছে।

ছবি : অমিত চক্রবর্তী

এই মুহূর্তে

নির্মলেন্দু গৌতম

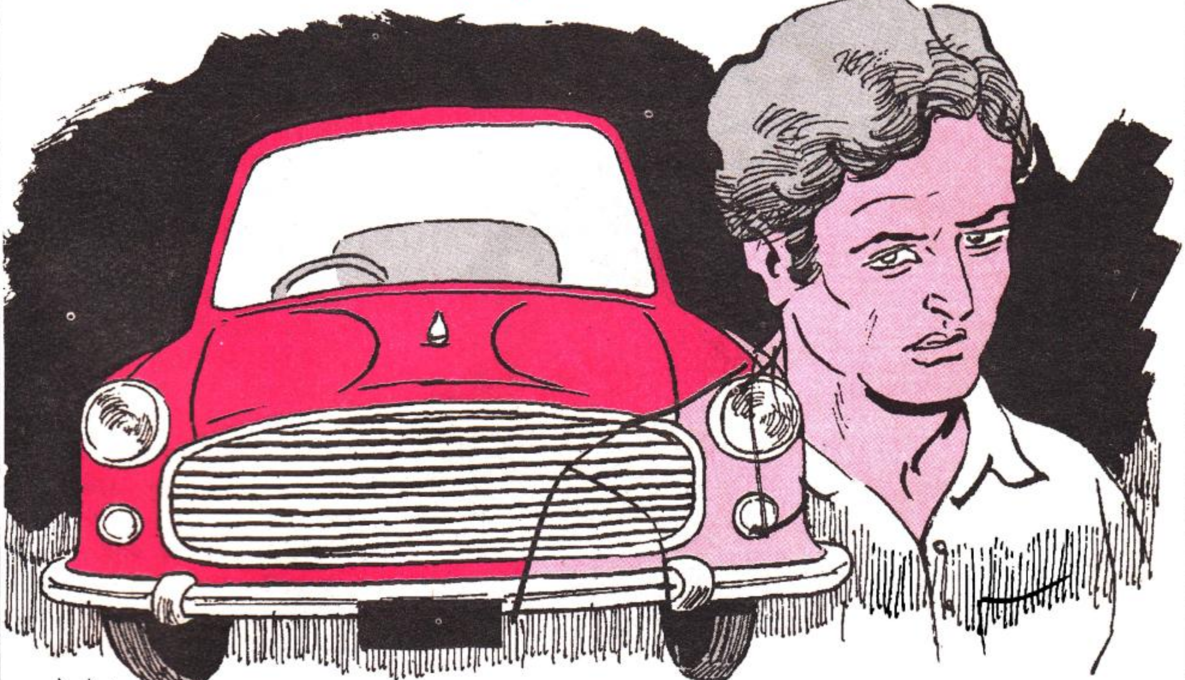

গাড়িটা দাঁড় করাতেই গেটের ডানদিকের বড় গাছটার অন্ধকার-অন্ধকার তলা থেকে প্রায় ছুটে এসে দরজাটা খুলে গাড়িতে উঠে পড়ল চন্দন। চন্দন যে এভাবে তৈরি হয়ে থাকবে, নিখিলেশ তা ভাবতেই পারেনি।

গাড়ির ভেতরের মৃদু অন্ধকারে চন্দনের দিকে তাকাল নিখিলেশ। চন্দনের মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মনে হল গম্ভীর, কী যেন ভাবছে চন্দন।

'কী, কী ভাবছিস?' গাড়ি চালাতে শুরু করে প্রশ্ন করল নিখিলেশ।

ইচ্ছে করেই বুঝি চন্দন কোনো উত্তর দিল না।

হাসল নিখিলেশ। বলল, 'ঠিক আছে, ভেবে যা তুই।'

বলে যেমনিভাবে গাড়ি চালাচ্ছিল, তেমনিভাবেই গাড়ি চালাতে থাকল নিখিলেশ।

একা একা রাতে বোলপুর পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে যেতে ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না নিখিলেশ। সেজন্যেই চন্দনকে খানিক আগে টেলিফোন করে বলেছিল সঙ্গে যাবার জন্য। একবারেই রাজি হয়ে গিয়েছিল চন্দন।

চন্দন যদি রাজি না হত, তাহলে ভারি মুশকিলে পড়ত নিখিলেশ। এভাবে হঠাৎ তার সঙ্গে কখনোই যেতে চাইত না কেউ। অবশ্য সুদীপ যদি থাকত, তাহলে কিছু ভাবত না নিখিলেশ। বলতে গেলে, নিখিলেশের ছায়াসঙ্গী ছিল সুদীপ। নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিখিলেশকে নিয়ে চলে যেত বোলপুরে। সুদীপের গাড়ি চালাবার হাতটাও ছিল চমৎকার। বছর দেড়েক আগে হঠাৎ ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় সুদীপ সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে। সুদীপের কথাটা ভাবলে সত্যিই নিখিলেশের মনের ভেতরটা যেন কিরকম হয়ে যায়।

এসব ভাবতে ভাবতেই বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে চন্দনের দিকে ফিরল নিখিলেশ। বলল, 'সত্যি, তুই রাজি না হলে যে কী করতাম, ভাবতে পারছি না।'

কথাটা শুনেও চন্দন নিঃশব্দ রইল।

না, আর কিছু বলল না নিখিলেশ। এই মুহূর্তে কেন জানি নিখিলেশের মনে হচ্ছে এমন কিছু একটা ঘটেছে, যার জন্য কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না চন্দনের।

কিন্তু কী ঘটতে পারে?

তার সঙ্গে এই যে এভাবে রাত্রিবেলায় বোলপুরে যাচ্ছে চন্দন, বাড়ির কারো কি তাতে মত ছিল না? হতেও পারে। নিখিলেশকে কথা দিয়েছে বলে জোর করেই হয়তো বাড়ি থেকে বেরিয়েছে চন্দন। হয়তো ঝগড়াও করতে হয়েছে খানিকটা।

সেজন্যেই সম্ভবত মেজাজটা ঠিক নেই চন্দনের। মেজাজটা ঠিক নেই বলে কথাও বলছে না।

যাকগে, কতক্ষণ আর এমনিভাবে মেজাজ খারাপ করে চুপ করে থাকবে? কথাটা ভেবেই সামনের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে থাকল নিখিলেশ।

ঠিক ন'টায় বড় পিসিমার টেলিফোন এসেছিল বোলপুর থেকে। হঠাৎ বড় পিসেমশাই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুটো ইনজেকশন দিতে হবে তাঁকে। একটা পাওয়া গেছে বোলপুরে। আরেকটা পাওয়া যায়নি।

ফিরে তাকাল গাড়িটার দিকে

কলকাতার বড় কোনও দোকানে পাওয়া যাবে সেটা। নিখিলেশকেই সেটা কিনে রাত ফুরোবার আগে পৌঁছে দিতে হবে।

টেলিফোনেই ইনজেকশনটার নাম লিখিয়ে দিয়েছিলেন বড় পিসিমা। সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ে ইনজেকশনটা কিনে এনেছিল নিখিলেশ। তারপর চন্দনকে টেলিফোন করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

গাড়িটা গোলমাল না করলে তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যেই বোলপুর পৌঁছে যাবে নিখিলেশ। হেডলাইটের আলোয় সামনের রাস্তার দিকে চোখ রেখে অকারণেই সুদীপের কথা ভাবতে ভাবতে নিখিলেশ বুঝি নিজের মধ্যেই নিজে হারিয়ে যেতে থাকল।

কলকাতা ছাড়িয়ে অনেকটা পথ আসবার পর হঠাৎ নিখিলেশের মনে হল, রাস্তার ধারে চায়ের দোকান পেলে গাড়ি থামিয়ে এখন এককাপ চা খেলে ভাল লাগবে। কথাটা মনে হতেই হঠাৎ চন্দনের দিকে ফিরে নিখিলেশ বলল, 'চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না তোর?'

চন্দন উত্তর দিল না।

'আমার কিন্তু চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। সামনে কোনো চায়ের দোকান পেলেই আমি নেমে পড়ব।' নিখিলেশ বলল।

চন্দন তবুও কিছু বলল না।

এখনও চন্দনের মেজাজটা তাহলে ঠিক হয়নি। মনে মনে কথাটা ভেবে এবার হাসল নিখিলেশ। ড্যাশবোর্ডের আলোয় হাতঘড়িতে সময় দেখল। তারপর যেমনিভাবে চালাচ্ছিল গাড়ি, তেমনিভাবেই গাড়ি চালাতে থাকল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই রাস্তার ধারের একটা চায়ের দোকানের সামনে এসে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিল নিখিলেশ। ছোট্ট একটা চায়ের দোকান। টিম্ টিম্ করে একটা আলো জ্বলছে ভেতরে। সেই আলোয় স্পষ্ট করে বুঝি দোকানের লোকটির মুখটাও দেখা যাচ্ছে না। ভেতরে পাতা বেঞ্চে একটা লোক বুঝি বসে বসে ঝিমুচ্ছে। রাত বারোটার নির্জনতার সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা কিরকম যেন মানিয়ে গেছে।

গাড়ি থেকে নেমে চায়ের দোকানের দিকে পা বাড়িয়েই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল নিখিলেশ। একটুখানি ঝুঁকে গাড়ির ভেতরের অন্ধকারে বসে থাকা চন্দনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সত্যিই চা খাবি না তো?'

চন্দন বুঝি নড়েচড়ে বসল। উত্তর দিল না।

দু'মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে চন্দনের দিক থেকে ফিরল নিখিলেশ। তারপর পায়ে পায়ে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'এককাপ চা হবে তো?'

'হবে।' বলে নিখিলেশকে একবার দেখে নিয়ে চা বানাতে শুরু করল লোকটি।

বোলপুর পর্যন্ত বোধহয় এমনিভাবেই যাবে চন্দন। চা তৈরি করা দেখতে দেখতেই নিখিলেশ ভাবল। কী করে যে চন্দন এমনিভাবে কথা না বলে থাকছে, নিখিলেশ বুঝি তা বুঝতেই পারছে না।

কাপে চা ঢেলে কাপটা নিখিলেশের দিকে এগিয়ে দিল লোকটি।

কাপটা হাতে নিয়ে চায়ে চুমুক দিল নিখিলেশ। ফিরে তাকাল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, চা না খেলেও গাড়ি থেকে নেমে বাইরে দাঁড়াতে পারত চন্দন। কী জানি, গাড়ির ভেতর কেন বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে চন্দনের!

গাড়ি থেকে নেমে একবার বাইরে দাঁড়াতে বলবে নাকি চন্দনকে?

না থাক, বলবে না। আসলে, বললেও যে চন্দন বাইরে এসে দাঁড়াবে না, নিখিলেশ সেটা ভালো করেই জানে। যাকগে, বোলপুরে গিয়েই কী ঘটেছে, তা জানবার জন্য চেপে ধরতে হবে চন্দনকে।

কথাটা ভেবেই একটু তাড়াতাড়ি চা-টা খেল নিখিলেশ। তারপর চায়ের দামটা মিটিয়ে গাড়িতে এসে উঠল।

যেমনভাবে বসেছিল চন্দন, ঠিক তেমনিভাবেই বসে আছে। ঠিক তেমনিভাবেই কী যেন ভেবে যাচ্ছে গভীরভাবে।

না, চন্দনকে কিছু বলল না নিখিলেশ। স্টার্ট দিয়ে চালিয়ে দিল গাড়ি।

ঠিক সোয়া তিনটেয় বোলপুরে বড় পিসিমার বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা দাঁড় করাল নিখিলেশ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বালিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন বড় পিসিমা।

বড় পিসিমা তাহলে জেগেই ছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন গাড়ির শব্দ শোনার জন্য।

'এসে গেছি বড় পিসিমা।' বলে ইনজেকশনের প্যাকেটটা নিয়ে গাড়ি থেকে নামল নিখিলেশ। তারপর চন্দনের দিকে ফিরে বলল, 'নেমে আয়।'

বলেই বারান্দার দিকে পা বাড়াল নিখিলেশ। চন্দনের কাছ থেকে কোনো উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না।

গেট পেরিয়ে বারান্দায় উঠে আসতেই বড় পিসিমা বললেন, 'তোর জন্যে খুব দুশ্চিন্তা করছিলাম।'

নিখিলেশ বলল, 'দুশ্চিন্তা করছিলে কেন?'

'সে কিরে, অতটা পথ রাতে গাড়ি চালিয়ে আসবি আর দুশ্চিন্তা করব না!' বড় পিসিমা বললেন।

হাসল নিখিলেশ। ইনজেকশনের প্যাকেটটা বড় পিসিমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'বড় পিসেমশাই এখন কেমন আছেন?'

'মোটামুটি ভাল। আপাতত ভয় পাবার মতো কিছু নেই।' বড় পিসিমা বললেন।

নিশ্চিন্ত হল নিখিলেশ। বলল, 'যাকগে, চলো বড় পিসেমশাইকে একবার দেখে আসি।'

'চল।' বলে নিখিলেশকে নিয়ে পা বাড়ালেন বড় পিসিমা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চন্দনের কথা মনে হল নিখিলেশের। দাঁড়িয়ে পড়ে ফিরে তাকাল চন্দনকে দেখবার জন্য।

না, চন্দনকে দেখতে পেল না নিখিলেশ। তার মানে, চন্দন এখনও গাড়ি

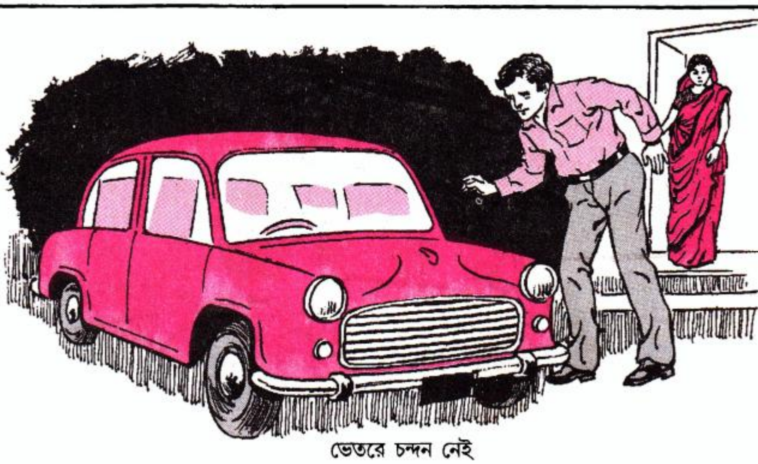

ভেতরে চন্দন নেই

থেকে নামেনি।

এখনও কেন গাড়ি থেকে নামেনি চন্দন? গাড়িতে বসে চন্দন একা একা কী করছে?

না, ঠিক কিছু বুঝতে পারছে না নিখিলেশ।

'কী হল?' খানিকটা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন বড় পিসিমা।

খানিকটা নিজের মনেই বুঝি নিখিলেশ বলল, 'গাড়ি থেকে নামছে না কেন চন্দন?'

'একবার ডাক তো চন্দনকে।' বড় পিসিমা বললেন।

বড় পিসিমার কথাটা শেষ হতেই উঁচু গলায় চন্দনকে ডাকল নিখিলেশ।

চন্দন কোনো উত্তর দিল না। গাড়ি থেকে নামলও না। কী হল ব্যাপারটা?

দু'মুহূর্ত ভাবল নিখিলেশ। তারপর হঠাৎ 'বড় পিসিমা একটু দাঁড়াও', বলেই বারান্দা থেকে নেমে পায়ে পায়ে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল নিখিলেশ। জানালা দিয়ে চোখ বাড়াল গাড়ির ভেতরে।

গাড়ির ভেতরে চন্দন নেই।

কোথায় গেল চন্দন?

গাড়ির ভেতর থেকে চোখ সরিয়ে এনে অন্ধকার ঢাকা চারদিকটা একবার ভাল করে দেখল নিখিলেশ। না, চন্দনকে দেখতে পেল না। মনে হচ্ছে যেন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেছে চন্দন।

নিখিলেশের বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল। ফের খানিকটা অধৈর্য গলায় চন্দনের নাম ধরে ডাকল নিখিলেশ।

না, চন্দন এবারও সাড়া দিল না।

নিখিলেশ ঠিক ভেবে পেল না, কী করবে এখন।

বড় পিসিমা বারান্দা থেকেই বললেন, 'কী হল রে নিখিলেশ?'

'চন্দনকে পাচ্ছি না।' অসহায়ভাবে বলল নিখিলেশ।

অবাক হলেন বড় পিসিমা। বললেন, 'চন্দনকে পাচ্ছি না মানে?'

'গাড়িতেও নেই চন্দন, বাইরেও নেই। এই যে ডেকে যাচ্ছি, সাড়াও দিচ্ছে না।' তেমনি অসহায়ভাবেই বলল নিখিলেশ।

বারান্দা থেকে নেমে এলেন বড় পিসিমা, কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'ইচ্ছে করে তোকে ঘাবড়ে দিয়ে মজা করবার জন্য কোথাও লুকোয়নি তো চন্দন?'

'না না, তা করবে কেন?' অন্যমনস্ক-ভাবে বলল নিখিলেশ।

দু' মুহূর্ত চুপ করে থেকে বড় পিসিমা বললেন, 'আসবার পথে তোর সঙ্গে রাগারাগি হয়নি তো?'

নিখিলেশ বলল, 'না না, রাগারাগি হবে কেন। বাড়ি থেকে বোলপুরে পৌঁছোনো পর্যন্ত একটা কথাও হয়নি ওর সঙ্গে।'

'সে কিরে! একটা কথাও হয়নি কেন?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন বড় পিসিমা।

নিখিলেশ বলল, 'কোনো কারণে বোধহয় মেজাজটা ওর ঠিক ছিল না।'

কথাটা শুনে কি যেন ভাবলেন বড় পিসিমা। তারপর বললেন, 'কি জানি, কিছু বুঝতে পারছি না। যাগ্‌গে, তুই ভেতরে চল। কিছুক্ষণ দেখেনি। তারপর ভাবা যাবে কি করব।'

সেটাই ঠিক। মনে মনে ভাবল নিখিলেশ। তারপর শেষ রাতের অন্ধকারে ঢাকা চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে বড়

টেলিফোনটা বাড়িয়ে ধরে

পিসিমার দিকে ফিরে বলল, 'তাই চলো।'

সকালের আলো ফুটল, কিন্তু চন্দনের কোনো খবর পাওয়া গেল না। অস্থিরভাবে বারান্দায় এসে দাঁড়াল নিখিলেশ। রাস্তার দিকে চোখ রাখল।

বড় পিসিমা এসে দাঁড়ালেন পাশে। বললেন, 'ব্যাপারটা কী হল বল তো?'

'বুঝতে পারছি না।' নিখিলেশ বলল।

বড় পিসিমা বললেন, 'কিছু বুঝতে পারছি না বললে তো চলবে না। কিছু একটা তোকে করতেই হবে।'

'কিন্তু কী করব তা ঠিক বুঝতে পারছি না।' অন্যমনস্কভাবে বলল নিখিলেশ।

ভেতরে টেলিফোন বাজছে। দ্রুতপায়ে টেলিফোন ধরতে চলে গেলেন বড় পিসিমা।

বারান্দা থেকে নামবার জন্য পা বাড়াল নিখিলেশ।

ঠিক তখুনি বড় পিসিমার রীতিমতো উত্তেজিত ডাক ভেসে এল ভেতর থেকে। কী হল?

ঘুরে প্রায় ছুটেই ভেতরে এল নিখিলেশ।

টেলিফোনটা নিখিলেশের দিকে বাড়িয়ে ধরে বড় পিসিমা বললেন, 'এই যে ধর, চন্দন টেলিফোন করেছে।'

'চন্দন!' লাফিয়ে উঠল নিখিলেশ। উত্তেজনায় ঝুঁকে পড়ল টেলিফোনের ওপর। বলল, 'কীরে, কোথায় তুই?'

'কেন, কলকাতায়।'

'কলকাতায় মানে!' লাফিয়ে উঠল নিখিলেশ।

'কলকাতায় মানে কলকাতায়। তোর সঙ্গে বোলপুর যাবার জন্য তৈরি হবার সময় হঠাৎ মেঝের ওপর পা হড়কে পড়ে পা ভেঙেছে। সঙ্গে সঙ্গেই বাবা তোকে টেলিফোন করেছিলেন। কিন্তু তুই তখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিস। আসলে, তুই ঠিক ঠিক পৌঁছেছিস কিনা, সেটা জানবার জন্যেই এখন টেলিফোন করেছি।'

না, উত্তর খুঁজে পেল না নিখিলেশ। অসহায়ভাবে ঘামতে থাকল।

চন্দন বলল, 'কিন্তু তুই আমায় ডাকতে আসিসনি বলে অবাক লাগছে। কেন আসিসনি বল তো?'

অসহায় ভাবেই এবার টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল নিখিলেশ।

বড় পিসিমা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কী বলল চন্দন?'

'এখানে আসবে না।' নিখিলেশ বলল স্থির চোখে বড় পিসিমার দিকে তাকিয়ে।

বলেই দ্রুতপায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বড় পিসিমা অনেক প্রশ্ন করবেন এখন। কিন্তু নিখিলেশ এখন কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারবে না।

এই মুহূর্তে নিখিলেশ স্পষ্টই বুঝতে পারছে, চন্দনদের বাড়ির সামনে পৌঁছুতেই যে তার গাড়িতে উঠে এসে বসেছিল, সে সুদীপ। নিখিলেশের ছায়াসঙ্গী। চন্দন যেতে না পারলে বাধ্য হয়েই একা বোলপুরে আসতে হত নিখিলেশকে। কিন্তু সুদীপ তা হতে দেবে কেন? তাই অমনিভাবে উঠে পড়েছিল নিখিলেশের গাড়িতে। একটু ভালো করে দেখলে নিখিলেশ ঠিক বুঝতে পারত, চন্দন নয়, সুদীপই ছিল সে।

গাড়ির ভেতরের আবছা অন্ধকারে তার পাশে বসে থাকা সুদীপের সেই ছায়া শরীরটাকে ভাবতে ভাবতে নিখিলেশ বুঝি শিউরে ওঠা এক অনুভবের মধ্যে একটু একটু করে তলিয়ে যেতে থাকল।

ছবি : দিলীপ দাস

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা হইতে শ্রী অরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

দেব সাহিত্য কুটীর-এর প্রকাশিত ও অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তক

ড. সুশীলকুমার বশিষ্ঠ

মাধ্যমিক ব্যাকরণ ও নির্মিতি প্রবেশিকা

BNG/B/IX-X/05/N00032P Dt. 23.03.05

কণা চট্টোপাধ্যায় • চন্দ্রাণী আচার্য

ব্যাকরণ ও রচনা রত্নাবলি (৭ম ও ৮ম)

BNG/B/VII-VIII/05/F00061H Dt. 23.03.05

শৈলেন চক্রবর্তী • পীযূষকান্তি দত্ত

নতুন ভৌত বিজ্ঞান

PHO/B/IX-X/05/L00014N Dt. 23.03.05

অমলকুমার মিত্র

জীব ও জীবন

LSO/B/IX-X/05/T00099V Dt. 07.04.05

প্রবীরকুমার পাত্র

মাধ্যমিক ভূগোল পরিচয়

GEO/B/IX-X/05/P00027R Dt. 23.03.05

ড. মহাদেব চক্রবর্তী • ননীগোপাল দেবনাথ

ভারতের ইতিহাস

HSO/B/IX-X/05/F00060H Dt. 23.03.05

কণা চট্টোপাধ্যায় • চন্দ্রাণী আচার্য

সন্দীপন (৭/৮ম শ্রেণি)

BNT/B/VII/05/L00048N Dt. 23.03.05
BNT/B/VIII/05/D00044F Dt. 23.03.05

কণা চট্টোপাধ্যায় • দেবব্রত রায় চৌধুরী

সহায়ক সঞ্চয়ন (৭/৮ম শ্রেণি)

BNS/B/VII/05/P00236R Dt. 07.04.05
BNS/B/VIII/05/D00044F Dt. 23.03.05

শৈলেন চক্রবর্তী • প্রণব সরকার

নতুন বাংলা পাঠ (৭ম শ্রেণি)

BNT/B/VII/05/N00046P Dt. 23.03.05

শৈলেন চক্রবর্তী • নিখিল কুমার সামন্ত

নতুন বাংলা পাঠ (৮ম শ্রেণি)

BNT/B/VIII/05/F00043H Dt. 23.03.05

শৈলেন চক্রবর্তী • নিখিল কুমার সামন্ত

নতুন বাংলা সহায়ক পাঠ (৭ম শ্রেণি)

BNS/B/VII/05/R00226T Dt. 01.04.05

শৈলেন চক্রবর্তী • প্রণব সরকার

নতুন বাংলা সহায়ক পাঠ (৮ম শ্রেণি)

BNS/B/VIII/05/N00037P Dt. 23.03.05

পি. সি. মজুমদার অ্যান্ড ব্রাদার্স

ছোটোদের ভূচিত্রাবলী (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণি)

দেব সাহিত্য কুটির সম্পাদিত

নতুন পৃথিবীর মানচিত্র (৯ম ও ১০ম শ্রেণি)

শৈলেন চক্রবর্তী

নতুন বাংলা বানান অভিধান

ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক/শিক্ষিকাদের উপযোগী আধুনিক বানানের সংকলন

নমুনা কপির জন্য যোগাযোগ করুন

দেব সাহিত্য কুটীর

২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯ • ২৩৫০/৭৮৮৭/৪২৯৫/৪২৯৪

বাহাদুর বেড়াল

Registration No. SSRM/Kol/RMS./W.B./RNP-187/2004-06 June "Suktara".